গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ - ১৬ সংখ্যা-১ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৯ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ২০ টাকা

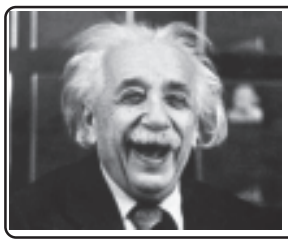

সুভাষিতম্

"মাত্র দুটি অসীম বস্তু আছে—এক মহাবিশ্ব, আর এক মানুষের মূর্খতা—তবে আমি মহাবিশ্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।"

—অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

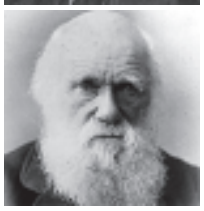

আমাদের কথা : জয় বিজ্ঞানের জয়

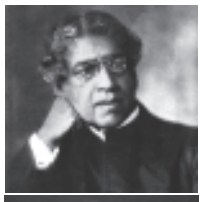

সারা বছর উৎসবে ডুবে থাকলো মানুষ। লক্ষণীয়, উৎসবের সিংহভাগ অংশের কেন্দ্রে থাকলো কোন না কোন ঈশ্বরের জয়গান। সেই কল্পিত পরমপুরুষের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হল চরাচর। অন্যদিকে বিজ্ঞানের জয়ধ্বনি শোনা গেল না কোথাও। যদিও বর্তমান মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকান্ডই বিজ্ঞানের নির্যাসেরই ফসল। গরমে দেহ ঠান্ডা অথবা শীতে উষ্ণতার সন্ধান—সকল অবস্থানেই বিজ্ঞানের দারস্থ হতে হয়। জেগে থাকা অবস্থানে অথবা নিদ্রায় বিজ্ঞানই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কাছের যোগাযোগ কিংবা সুদূরের হাতছানিতে বিজ্ঞানকে সাথে নিতেই হয়। মানুষের আয়ুর সীমানাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান। পশু অবস্থান থেকে মানবিকতার উত্তরণে বিজ্ঞানের যুক্তি চেতনার আলোক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রাচীন যুগের অন্ধকার হিংস্রতাকে কাটিয়ে মানবিকতায় উত্তরণ বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ফসল। আমাদের চিন্তা স্বাধীনতার মুক্তি বিজ্ঞানের আলোয় আলোয়।

যদিও আদি বনমানুষ থেকে আজকের আধুনিক সভ্য মানুষে উত্তরণে বিজ্ঞানের এই পথ চলা হাজার হাজার বিজ্ঞানীর নিরলস অধ্যাবসায় ও বস্তুনিষ্ঠ সত্যের জন্য মরণপণ সংগ্রামের ফসল। আসুন শত শত বছরের বিজ্ঞানের এই পথচলার ইতিহাসের মশালধারী আর্যভট্ট, গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন, জগদীশ চন্দ্র, এডিসন, আইনস্টাইন, মাদাম কুরি, ফ্লেমিংদের মত শত শত মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমরা জয়ধ্বনি দিই।

সবাই সমস্বরে বলি—'জয় বিজ্ঞানের জয়'।

—তাপস মজুমদার

সা গ্নি ক

প্রচ্ছদ কথা : পাখি সব করে রব

গুপী গাইন বাঘা বাইন সিনেমায় ভূতের রাজার কাছ থেকে গুপীরা তিনটি বর চেয়ে নিয়েছিল। খাদ্য ও পরিধেয়র সমস্যা মেটার পর বাসস্থানের পরিবর্তে তাঁদের স্বপ্নের দেশ বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছিল। আসলে ভূত যেমন মানুষের কল্পনা, মানুষের ওড়ার ইচ্ছাটাও মানুষের স্বপ্নে থেকে যায়। কিন্তু বাস্তব হল, সমগ্র জীবজগতে পতঙ্গ ছাড়া একমাত্র পাখিই পারে লম্বা উড়ান দিতে। পাখিই তো আকাশে ওড়ার নেপথ্যের প্রথম প্রেরণা। তাই মানুষের মনরাজ্যে পাখিদের একটা বিশেষ স্থান আছে। তারা পাখিকে জানতে চায়। এই জানার আগ্রহেই বাংলায় পাখিদের নিয়ে ইতিমধ্যে প্রায় দেড়শ বই বেরিয়ে গেছে। অধিকাংশ বইতে বিভিন্ন পাখির আকার আকৃতি, বাসস্থান, স্বভাব ইত্যাদি লিপিবদ্ধ। কোন কোন বইতে পাখিদের বিশেষ কিছু বিষয় জানা যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকে বাংলায় পাখিচর্চার সামগ্রিক বই কোথায়? কিংবা প্রকৃতি পরিবেশের সাথে পাখির সম্পর্কের অধ্যয়ন?

জানতে ইচ্ছে করে পাখির উড়ান পদ্ধতি, এর কারিগরি দিক। কোন পদ্ধতিতে পরিযায়ী পাখিরা অনায়াসে হাজার হাজার কিমি যাত্রায় পৃথিবীর এপার ওপার করছে। কিংবা এরা এলো কোথা থেকে? বৈচিত্রময় পাখিদের শ্রেণিবিভাগ করব কিভাবে? পাখি দেখব চিনব কি করে? ভারতে কতদিন ধরে এই পাখিচর্চা চলছে?

অন্যদিকে যে কোন পাখির দিকে তাকালেই তাদের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য নজর কেড়ে নেয়। যেমন— তাঁদের পালক, পালকের বিচিত্র রঙ। তাঁদের ঠোঁট বা চঞ্চু-এর ভিন্ন আকার। পাখির ডিম—তার ভিতর ও বাইরের দিকগুলি। দেখতে ইচ্ছে করে কিভাবে ডিম ভেঙ্গে তাদের মিষ্টি বাচ্চারা এ জগৎ দেখছে। জানতে ইচ্ছে করে তাদের বাসার কথা, ভালোবাসার কথা। কিংবা যার বাসা নেই সে কিভাবে অন্য পাখির বাসা ব্যবহার করে? বাচ্চার প্রতি পাখিদের অপত্য স্নেহ কতটা? এছাড়াও জানতে চাই পাখির কলকাকলি বা ডাক কত রকমের? শিকারি

পাখিরা তাদের শিকার অনুসন্ধানে কেমন?

পাখি দেখতে দেখতেই কয়েকটি আপাত অদ্ভুত প্রশ্ন ভিড় করে—পাখিরা কি হাই তোলে? পাখিরা কি ধুলো দিয়ে স্নান করে? পাখিরা কি পাথর খায়? পাখিরা শরীরচর্চা করে?

সুউচ্চ পর্বত থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত পাখিদের বৈচিত্র্যের সন্ধান পেতে চাই। জলাশয় অবলম্বন করে যে পাখি—তাদের আচরণ কেমন? জানতে চাই পৃথিবী থেকে যে পাখিরা চিরতরে হারিয়ে গেছে তারা কারা? গাছ ও গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পাখিদের রক্ষায় কোন আন্দোলন হয়েছে কি? এদের জন্য আইনি রক্ষাকবচ কিছু আছে কি? যদিও মানুষমাত্র ফুল ও পাখি ভালোবাসে, তবু পাখি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ মানুষের সংখ্যা নগণ্য। এরকম মানুষ—সেলিম আলির পাখি চর্চা জানতে চাই। কিংবা পাখিদের জন্য যারা হৃদয়ের দরজা খুলে রেখেছেন—নিজের বাড়ির চৌহদ্দিতে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন তাদের চিনতে চাই।

মানুষের মনজগতে পাখির স্থায়ি আস্তানা। বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে পাখিরা আছে। কবিতায় আছে। ডাকটিকিট, মুদ্রা, ভাস্কর্যে, ছোটদের বড়দের আঁকায় পাখিরা বসছে ডাকছে উড়ছে।

আনন্দ সংবাদ

বিজ্ঞান অন্বেষক এর পক্ষ থেকে উপরে উল্লিখিত পাখিদের নিয়ে সমস্ত জানা অজানা গবেষণা ঋদ্ধ 'পাখি সব করে রব'—বইটি চিত্রিত লিপিবদ্ধ হয়ে বেরোচ্ছে। প্রতিটি পাতা প্রাসঙ্গিক রঙিন চিত্রে সমৃদ্ধ। ২০১৯-এর জুন মাসে বইটি প্রকাশিত হবে। আশা করি, প্রকৃতি প্রেমীদের ভালোবাসার বই হবে 'পাখি সব করে রব' নন্দিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞান অন্বেষক-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 'পাখি সব করে রব' বইটির জন্য ৩০০ টাকা অগ্রিম অনুদান সংগ্রহ করা হচ্ছে। অগ্রিম দাতারা বইটির বিক্রয়মূল্যের ৪০ শতাংশ ছাড়ে বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

যোগাযোগ : 9474330092

তপনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ কি সত্যিই বুদ্ধিমান প্রাণী?

বিজ্ঞানীরা একটা দল বা পরিবারের প্রাণীদের বলেন primate; বাংলায় আমরা বলি বনমানুষ। যদিও এই দলে মানুষও পড়ে, তবে বনমানুষ বলতেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে দশাসই, গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো ভয়ংকর একদল প্রাণী। কথাটা ঠিক নয়। এই দলে যেমন দশাসই গোরিলা আছে, আছে ছোট্ট টোম্যাটো বা ডিমের মাপের (ওজন ৫৫ গ্রামের মত) 'ইঁদুর লেমুর' (mouse lemur)। আর সুমো কুস্তিবিদদের মানুষদের সঙ্গে তুলনা করলে, সেই মানুষদের ওজন তো গোরিলাদের চেয়েও বেশি। পৃথিবীতে চারশোর ওপর প্রজাতির বনমানুষ খুঁজে পাওয়া গেছে, গত বছরই পাওয়া গেছে আরো একটি প্রজাতি। খোঁজা এখনো চলছে।

এই গোত্রের প্রাণীদের ছটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

১) এদের দুটো চোখই (মুখে চোখের মণির অবস্থান সামনের দিকে) একই জিনিস দুচোখে একসঙ্গে দেখে, তাই বস্তুর তিনমাত্রার অবস্থানটা পরিষ্কার বুঝতে পারে, যদিও মাথা না ঘুরিয়ে পেছনদিকে দেখতে পায় না।

২) চোখদুটো বসে আছে শক্তপোক্ত আংটির মত হাড়ের কাঠামোর নিরাপত্তায়।

৩) বুড়োআঙুল আছে ফলে এরা কোনকিছু ভালোভাবে মুঠোয় ধরতে পারে।

৪) প্রত্যেকটা আঙুলের ডগাকে আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্যে নোখ আছে।

৫) এদের হাত বা পায়ের পাতায় লোম নেই এবং প্রত্যেক বনমানুষের নিজের আঙুলের ছাপ আছে, যেটা একান্ত সেই বনমানুষেরই।

৬) অন্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় এদের মস্তিষ্ক অনেকটাই বড়, যার ফলে এরা কোন আচরণ দেখে শিখতে আর সেই আচরণ নিজে করে দেখাতে পারে (ভেঙচি কাটতেও পারে)। অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় অনেক বুদ্ধি ও দুষ্টুবুদ্ধি ধরে বেশি।

জন্মের পর থেকে বনমানব বড় হয় একটা সংগঠিত সামাজিক পরিবেশের মধ্যে প্রায় আমাদেরই মত—

- প্রথমে শিশু বনমানব থাকে তার মায়ের কোলে (এই সময়টায় তারা পুরোপুরি মায়ের দুলাল)।

- পরের দশা বালক বনমানব, তারা বেশিটা সময় খেলা, বড়দের নকল করা, কি খাবে, কোথা থেকে আবার জোগাড় করবে, দলের কোন বড়োর সঙ্গে কি রকম আচরণ করবে, তাদের সমাজের রীতিনিয়ম শিখতে থাকা।
- তৃতীয় বা কৈশোরে তাদের যৌন চেতনা জাগে, সম্পর্ক তৈরি হয় (প্রেমে হাবুডুবু খাবার বয়েস)।

- পরের দশায় আসে সংসার (মাতৃত্ব বা পিতৃত্বের দায়িত্ব)।
- পঞ্চম দশায় তারা অভিজ্ঞ সন্তানপালক, বিভিন্ন বয়সের সন্তান সামলাতে অভ্যস্ত, মানিয়ে চলতে পারে তার নিজের সামাজিক অবস্থান (গোষ্ঠীর নেতা বা অন্য ক্ষমতাবানদের)।
- ক্রমে হয়ে ওঠে নিজের সমাজের ঠাকুমা বা ঠাকুর্দা, বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব—যে সমাজের প্রবীনত্ব বা নেতৃত্ব রক্ষা করে নিজেদের মধ্যে খুচরো বিবাদ মেটায়।
- বনমানুষদের শেষটা সাধারণত হয় কোন শিকারী প্রাণীর আক্রমণে, অশক্ত শরীরকে যে অন্তিম নিষ্কৃতি দেয়।

মানব (hominid) পরিবারের শরীর আর জীবনযাত্রা দেখে, আমি তো জীবনের শেষ অংশটা ছাড়া আমাদের সঙ্গে বিশেষ ফারাক দেখতে পাচ্ছি না। একটাই তফাৎ, আমাদের অন্তিম নিষ্কৃতি এখন হয় হাসপাতালে। বন থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি মোটে দশ হাজার বছরের কিছু আগে পরে, তৈরি করেছি কংক্রিটের জঙ্গল। ওরা মানবজীবনের মূল সুরটা ধরে রেখে থেকে গেছে সবুজের মধ্যে প্রায় পঞ্চান্ন/ষাট নিযুত (সাড়ে পাঁচ থেকে ছ কোটি) বছর ধরে। মানুষ নামের প্রজাতি পৃথিবীতে এসেছে মেরেকেটে মাত্র নব্বই হাজার বছর আগে। আমরা মানব সভ্যতার উন্নতির (?) শেষ একশো বছরে নিজেদের আর আরো অন্য অনেক প্রাণীর জীবন বিপন্ন করে ফেলেছি। বিগত পাঁচ থেকে ছয় কোটি বছরে ওরা প্রকৃতির কোন ক্ষতিই করেনি। নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে।

আধুনিক গবেষণা বলছে, ওরা হাসে, শোক পালন করে, উদাস হয়, অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, নতুন কিছু শিখতে পারে, এমনকি শেখালে মানুষের ভাষাও বুঝতে পারে। শেখালে মানুষের সঙ্গে ইঙ্গিতে (আমেরিকান সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ; কোকো নামের এক গোরিলা, আমেরিকায় প্রায় ৩০০ শব্দ ইঙ্গিতে বলতে পারত) কথাও বলতে পারে। প্রকৃতিতে নিজেদের ভেতর ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।

এদের বনমানুষ বলে দূরে সরিয়ে রাখতে আমার বাধে। আমরা নিজেদের নাম দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স বা বুদ্ধিমান প্রাণী, যারা উন্নয়নের নামে বিজ্ঞানের ব্যবহারের শক্তিতে বলমান হয়ে মাত্র একশো বছরে পৃথিবীর পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলেছে, তারা বুদ্ধিমান, না যে মানুষগুলো প্রকৃতিতে মিশে নিজেদের জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তারা বুদ্ধিমান!

আপনি কি বলেন?

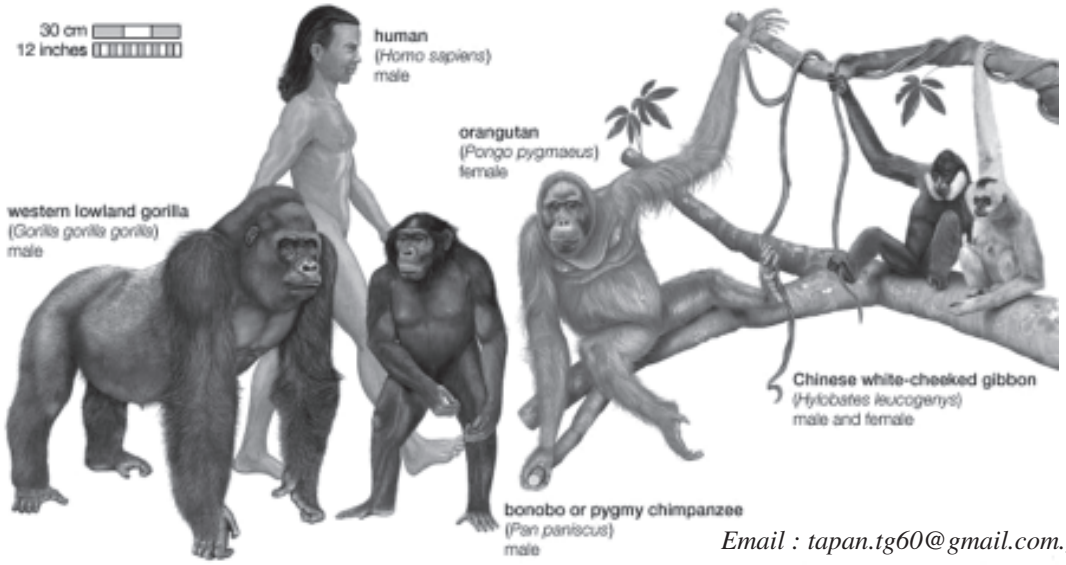

Email : tapan.tg60@gmail.com., M. 9836989347

তাপস মজুমদার

একটি স্বপ্নের বিস্তৃতি : সোনম ওয়াংগচুক

থ্রি ইডিয়ট

সোনম ওয়াংগচুক

সিনেমা 'থ্রি ইডিয়ট'-এর একটি দৃশ্য ঃ

'মেশিন কি? What is a machine?'—শিক্ষকের প্রশ্ন। যে সে শিক্ষক নন। ভারতের একটি প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক। ছাত্ররাও কম নয়। তাঁরা বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মার্কস প্রাপ্তরা। কঠিন প্রতিযোগিতায় অনেককেই পিছনে ফেলে এই কলেজে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে। কলেজের প্রথম দিন। স্বপ্ন দেখছে আরও উচ্চতায় পৌঁছবার। এর মধ্যেই একটি ছাত্রের মুখের হাসি শিক্ষককে বিব্রত করল। ছাত্রটি রেঞ্চো। শিক্ষক তাঁকেই প্রশ্নটি করলেন। রেঞ্চোর তাৎক্ষণিক উত্তর—'এমন জিনিস যা মানুষের কাজকে সহজ করে। তাই মেশিন। যেমন গরমে ফ্যান—মেশিন। দূরের বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য মোবাইল—মেশিন। এক চুটকিতে জটিল গণনা ক্যালকুলেটর—মেশিন। আসলে আমাদের জীবনকেই ঘিরে রেখেছে—মেশিন। জীপ উপর নীচে টেনে আমরা আমাদের ট্রাউজার বন্ধ খোলা করছি—মেশিন। কিন্তু এই উত্তর শিক্ষক মহাশয়কে একেবারেই সন্তুষ্ট করতে পারলো না। কারণ বইতে মেশিনের সংজ্ঞা হুবহু এরকম ছিল না। তাই আবার তিনি ছাত্রদের কাছে প্রশ্নটি রাখলেন। এবার অন্য একটি ছাত্র চতুরের উত্তর— "Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained and by which means, force and motion may be transmitted and modified as a serew and its nut, or a lever arranged to turn about a fulerum or a pulley about its pivot, etc. especially, a construction, more or less complex consisting of a conbination of moving parts, or civil mechanical elements, as wheels, levers, coms etc." এই উত্তরে শিক্ষক মহাশয় খুব খুশি হলেন। কিন্তু রেঞ্চো বলল, 'আমি তো একই উত্তর দিয়েছিলাম। সহজ ভাষায়। শিক্ষক রেগে গেলেন। বললেন—'বইয়ের ভাষায় না বললে তোমরা নম্বর পাবে না।' এমনকি শিক্ষক ছাত্রটিকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে চলে যেতে বললেন। রেঞ্চো ধীরে ধীরে কক্ষের বাইরে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এলো।

অবাক শিক্ষক—'আবার ফিরে এলে কেন?'

রেঞ্চো—'কিছু ভুলে গেছি নিতে?'

শিক্ষক—'কি?'

রেঞ্চো— 'Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information; that are illustrated nonillustrated hard bound, paper back, jacketed norjacketed, with forword, introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment and education of the human brain though the sensory route of vision, sometimes touch.'

শিক্ষক—'কি বলতে চাও?'

রেঞ্চো—'বই। নিতে ভুলে গেছি।'

শিক্ষক—'সরাসরি বলতে পারো না?'

রেঞ্চো—'কিছুক্ষণ আগে সেই চেষ্টাই করেছি। কিন্তু আপনার পছন্দ হয়নি।'

উপরের কথোপকথন আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির অসারতাকেই প্রকাশ করছে। দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র বই মুখস্থের মাধ্যমে শিক্ষার এই পদ্ধতি এমনকি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান স্তম্ভ যুক্তি, চিন্তা, কল্পনা ও বোধের আয়ত্ত্বের বিপরীতেই অবস্থান করছে। আমির খান (রেঞ্চোর ভূমিকায়) অভিনীত এই সিনেমার সমগ্র অংশে জুড়ে রেঞ্চো ও কলেজের ডিরেক্টরের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য কখনো—পড়াশুনার অসম্ভব চাপ, ফলস্বরূপ আত্মহত্যা, কখনো—বোধের বাইরে অতিরিক্ত বই নির্ভরতা, কখনো জীবনের সাথে যোগহীন বিজ্ঞান চর্চা অথচ ছদ্ম শিক্ষাপ্রাপ্তির সীমাহীন দাম্ভিকতা, কখনো অভিভাবকের অসীম চাহিদার মানসিক চাপের শৃঙ্খলের কথা বলা হয়েছে। যেখানে অজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা নেই। আনন্দ নেই। আছে শুধু ভয়। চাহিদা পূরণে পিছিয়ে পড়ার ভয়। যেখানে ডিরেক্টর বারংবার বলছেন—'জীবন একটা দৌড়

প্রতিযোগিতা। জোড়ে না দৌড়লে তোমাকে অন্যজন মাড়িয়ে এগিয়ে যাবে।' দৌড় দৌড়। মনের দরজায় তালা দিয়ে দৌড়। এখানেই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী' বা 'তাসের দেশ'-এর কথা। এইরকম প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এক অচলায়তনে একমাত্র ব্যতিক্রম র‍্যাঞ্চো। প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে তার অবস্থান। সত্যি হল আমাদের সকলের মনেই একজন 'রেঞ্চো' আছে। যে চায় সব অবরোধকে ভেঙে ফেলতে।

এখানেই আমাদের প্রশ্ন সিনেমার 'রেঞ্চো' কি শুধুই কল্পনা? সিনেমাওয়ালারা বলছেন—"না। এর সবটাই কল্পনা নয়। লাদাকের এক আশ্চর্য মানুষ সোনম ওয়াংগচুক-এর ছায়া এতে পড়েছে।" আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। আমরা জানতে চিনতে চাই তাকে। তাকে চিনতে হলে লাদাকদের ভৌগোলিক পরিবেশ বুঝতে হবে।

লেহ লাদাককে বলা হয় ঠান্ডা মরুভূমি। যেখানে শুষ্ক ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায় সকল সময়। শীতের সময় মোটামুটি -২০° সে. তাপমাত্রা থাকে। একমাত্র মে জুন জুলাইয়ে তাপমাত্রা বরফ গলনাঙ্কের উপরে ওঠে। তখন তাপমাত্রা মোটামুটি ৩° সে. থেকে সর্বোচ্চ ২৫° সে. পর্যন্ত থাকে। হিমালয়ের পাদদেশে ৩০০০ মিটার উচ্চতায় লেহ জেলার আলচির কাছে ছোট্ট গ্রাম উলটোকোপোতে ১৯৬৬তে ওয়াংগচুকের জন্ম। এমন একটি দেশের রুক্ষ পাহাড়ি ভূমিতে যে শিশুরা খেলছে, লাফাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যেই তিনি ছিলেন। ঝর্ণা, নদীনালা, সবুজ ক্ষেত এই সকলই তাঁর চারণক্ষেত্র। ৯ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্যে নির্মল প্রকৃতির কোলেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। মা ও প্রকৃতির কাছেই তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। প্রচলিত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে ছিল তার অবস্থান। এরপর তাকে শ্রীনগরের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। যেন—প্রকৃতি থেকে একটি গাছকে উপরে নিয়ে আসা হল। সেখানকার পড়াশুনার মাধ্যম 'অন্য গ্রহের ভাষা (ইংরাজি ও উর্দু)' তাঁর বোধের বাইরে থেকে গেল। তাঁর এই 'বুঝতে না পারা' তাঁকে 'মূর্খ' প্রতিপন্ন করল। সেই সময় ছিল তাঁর জীবনের অন্ধকারতম অংশ। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে ১৯৭৭ সালে তিনি এখান থেকে পালালেন। দিল্লি গেলেন। এখানে বিশেষ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করলেন।

এই সময় পিতার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হল। পিতার ইচ্ছা তখনকার সময়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় ছেলেকে শিক্ষা দিতে। কিন্তু ততদিনে ছেলে দর্পণ ও আলোর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় আকর্ষিত হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে আরও জানার ক্ষুধা বেড়ে গেছে। সে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়। পিতা কিছুতেই মেনে নিলেন না। ফল বিচ্ছেদ। পিতা বলে দিলেন তিনি পড়াশুনার কোন খরচ বহন করবেন না। ছেলে বলল—'গুড বাই'। মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক করার জন্য ভর্তি হয়ে গেলেন শ্রীনগরের National Institute of Technology তে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ কোথায় পাবেন? বাধ্য হয়ে ছোট শিশুদের টিউশান দেওয়া শুরু করলেন। এখান থেকেই তাঁর জীবনের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তিনি এক অজানা জগতে প্রবেশ করলেন। যেখানে তিনি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর মাত্র ৫ শতাংশ উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৈন্য কেন? অনুসন্ধানে দেখলেন, পাহাড়ী শিশুদের ক্ষেত্রে বইয়ের ভাষা (ইংরাজী ও উর্দু) দুর্বোধ্য। এবং বইয়ের বিষয়-বস্তুগুলিও অজানা। যেমন ধরুন তাঁদের পড়ানো হচ্ছে- F for Fans, S for Ship. T for Train ইত্যাদি। লক্ষণীয় এই বৈদ্যুতিক পাখা, জাহাজ, ট্রেনকে তারা চোখেই দেখেনি। এ যেন চেনা জানা জগতের বাইরে অন্য গ্রহের গল্প। দেখলেন পাঠ্য বইয়ের পাঠক্রম ধাপে ধাপে লাদাক—শ্রীনগর—দিল্লি—লন্ডনের বইয়ের নকল। স্থানীয় বিষয়বস্তুর বা ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। সবকিছুই কাগুজে জ্ঞান। চা বানানোর পদ্ধতি মুখস্থ করতে বলবেন—অথচ কেউ চা বানাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও এই অচল অসফল ব্যবস্থার কোন বদল আনার কথা কেউ ভাবতে পারতো না। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই সোনম ওয়াংগচুক অন্যরকম ভাবলেন। তিনি ভাবলেন, এখানে শিশুরা অসফল হচ্ছে না—হচ্ছে শিক্ষা প্রণালী। তাই ১৯৮৮তে তিনি, তার ভাই ও পাঁচজন সমান ভাবনার শরিকেরা এক হলেন। তৈরি করলেন একটি সংগঠন। নাম Students' Educational and Culture Movement of Ladakh (SECMOL)। বেছে নিলেন সেসপোলের একটি বিদ্যালয়। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল বদল আনলেন। প্রথমেই পাঠ্যবইগুলির ভাষায় আনলেন মাতৃভাষার চলন। এতে শিশুদের কাছে পাঠ্য বইয়ের বিষয়বস্তুগুলি অনেক বেশি বোধগম্য হল। তিনি মনে করতেন মাতৃভাষা সঠিক আয়ত্বে থাকলে অন্যভাষাগুলি সহজেই আয়ত্বে আনা যায়। শুধু ভাষার চিন্তাই নয়। কি শিক্ষা দেব এবং কিভাবে দেব—দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মানতেন—যা শুনবো তা ভুলে যাবো, দেখলে মনে থাকবে এবং হাতে কলমে করলে তা জ্ঞান হয়ে যাবে। তাই জীবনের চলার পথে যা প্রয়োজন তাই শিখবে। সেই শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে হবে। মাতৃভাষা ও সহজ বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে পড়ালে ওরা সহজে বুঝতে পারবে। তবে এখানে পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাকবে না। থাকবে সহযোগিতা। কারণ পারস্পরিক সহযোগিতাতেই বড় বড় কর্মকান্ড সংগঠিত হয়। তবে নিজেকে আরও উন্নত করার জন্য নিজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

প্রথমে একটি বিদ্যালয় দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হল। নতুন শিক্ষা পাঠক্রম আনলেন। অভাবনীয় সাফল্য পেলেন। তাঁদের সাফল্য পার্শ্ববর্তী অন্য বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করল। তাঁরাও এর প্রয়োগ করলেন এবং সাফল্য পেলেন। উৎসাহিত করল সরকারকেও। এবার লাদাক জুড়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় SECMOL নতুন শিক্ষাপ্রকল্প 'Operation New Hope' শুরু করলেন। চমকে দেওয়া ফলাফল পাওয়া গেল। বোর্ড পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হারে বিরাট উল্লম্ফন হল। শুরুর উত্তীর্ণের ৫ শতাংশ থেকে কয়েক বছরে ৭৫ শতাংশ হয়ে গেল। উত্তীর্ণের শতকরা হার নিম্নরূপ—

৫%	৭%	২৩%	৩৪%	৪৯%	৫৫%	৭৫%
১৯৯৬	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০৩	২০০৪	২০১৫

এই সফলতাও ওয়াংগচুককে থামাতে পারলো না। তিনি ভাবলেন বাকি ২৫% ছাত্ররা কেন সাফল্য পেল না? তাদেরকে কিভাবে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যাবে?

প্রশ্ন—এই কাজে কি তিনি সফল হবেন? তিনি কিভাবে বিজ্ঞান ও জীবনকে মিলিয়েছেন? কিভাবে তার আবিষ্কারগুলি বিশ্ব জয় করল?

সকল প্রশ্নের উত্তর পাবো পরের সংখ্যায়।

Email : sagnikart@gmail.com., M. 9874778216

কৌশিক রায়

এক অপার্থিব কণার সন্ধানে

কোনও বস্তুর পরমাণুর মধ্যে থাকা তিনটি কণিকাকেই আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে চিনে থাকি পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমে। এরা প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন। তবে, বিশ্বের এই বিশাল বস্তুজগতে এই তিনটি কণা ছাড়াও ফোটন, ট্যাকিওন, পজিট্রন, মেসন (জাপানী বিজ্ঞানী-হিদেকি ইউকাওয়ার দ্বারা আবিষ্কৃত) এবং বোসন (ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বোস-এর নামে নামাঙ্কিত)-এর মতো আরো বেশ কয়েকটি, অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণিকা (Sub-Atomic Particles) আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে, এদের মধ্যে একটি বস্তুকণিকা সত্যিই অপার্থিব এবং রহস্যময়। কণিকাটির নাম হলো নিউট্রিনো। এই খামখেয়ালি বস্তুকণিকাটির সুলুকসন্ধান শুরু করেছেন পদার্থবিজ্ঞানীরা—পাহাড়ের কোলে একটি নিভৃত স্থানে।

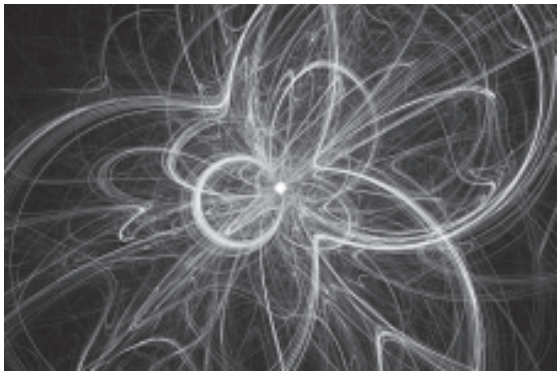

নিউট্রিনো

১৯৯১ সালে সোভিয়েত গণরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে জর্জিয়া নামক রাষ্ট্রটি। এই রাষ্ট্রটির রাজধানী শহর—ৎবিলিসি এবং অন্য দুটি নগরী—কুতাইসি ও বাতুমি, স্থাপত্যশৈলী, ভাস্কর্য এবং ক্রীড়াঐতিহ্যে অতি উন্নত। তাদের পাশে ককেশাস পর্বতের বরফে ঢাকা নির্জনতার মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট্ট শহর—নিয়াইত্রিনো-র গুরুত্ব অনেকটাই কম। তবুও চিকিৎসাবিদ্যার জনক—হিপ্পোক্রেতুস-এর জন্মস্থান রূপে গ্রীসের ছোট্ট দীপ-কস যেমন বিশ্বখ্যাত হয়েছিলো, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবক—অ্যান্টনি ভ্যান লিউয়েন হৌক-এর জন্মস্থল হিসেবে বিজ্ঞানের মানচিত্রে যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো হল্যান্ডের ডেলফ্‌ট্ নামক গণ্ডগ্রামটি—তেমনি নিউট্রিনো কণিকা সম্পর্কে গবেষণার একমাত্র কেন্দ্ররূপে বিশ্বের পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে জর্জিয়ার এই নিয়াইত্রিনো শহরটি। আসলে, নিউট্রিনো কণিকার নাম থেকেই এই শহরটির নতুন নামকরণ হয়েছে। নিয়াইত্রিনো শহরে, ককেশাস পর্বতের মধ্যে প্রায় দুই মাইলের মতো সুড়ঙ্গ কেটে, প্রায় ১২০০০ ফিট গভীরে বানানো হয়েছে বাকসান নিউট্রিনো অবজারভেটরি নামক গবেষণাগারটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বের সৃষ্টির সময়ে সর্বপ্রথম বস্তুকণাকে আবিষ্কার করতে, ফ্রান্স এবং সুইৎজারল্যান্ডের সীমান্তে, আল্পস পর্বতমালার কোলে, ভূগর্ভে, ''সার্ন'' (CERN) নামক গবেষণাকেন্দ্রে ''লার্জ হ্যাড্রন কোলাইজার'' নামক এরকমই একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। জর্জিয়ার এই গবেষণাগারে, বহু লক্ষ্য বছর আগে মহাবিশ্বের বিভিন্ন কোণে ঘটে যাওয়া উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ডদের মহাবিস্ফোরণ, জ্যোতিষ্কের জন্মমৃত্যু, বিভিন জ্যোতিষ্কের মধ্য থেকে তরঙ্গাকারে বেরিয়ে আসা তাপ-আলোকশক্তি প্রবাহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য নিউট্রিনো কণিকাকে খুঁজে বের করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন মহাকাশ এবং পদার্থবিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানিয়েছেন—নিউট্রিনো একটি রহস্যময় বস্তুকণিকা। এই কণিকাটি কিন্তু তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না। পাথরের স্তর এবং আমাদের দেহ-র মধ্য দিয়েও অনায়াসে চলাচল করতে পারে এই অদৃশ্য নিউট্রিনো কণিকা। জানা গেছে একটি ইলেকট্রন কণিকার $\frac{\text{ত}}{\text{ততততততত}}$ ভাগ ওজন এই নিউট্রিনো কণিকার।

বাকসান গবেষণাগারে বিশাল পিপের মধ্যে রাখা আছে প্রায় ৬০ টনের মতো তরল গ্যালিয়াম ধাতু। এই ধাতুর মাধ্যমে সূর্যের কেন্দ্রস্থলে যে তাপীয় আণবিক বিক্রিয়া অনবরত ঘটছে—তার থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠে

বাকসান গবেষণাগার

আগত নিউট্রিনো বস্তুকণিকাগুলিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হচ্ছে। মার্কিন দেশের পদার্থবিজ্ঞানীরাও সাহায্য করে চলেছেন নিউট্রিনো কণিকাকে খাঁচায় বন্দী করার এই অভিযানে। এইজন্য এই পরীক্ষাকে বলা হচ্ছে সোভিয়েত আমেরিক্যান গ্যালিয়া এক্সপেরিমেন্ট (SAGE)। তবে ভূগর্ভের এই গবেষণা থেকে মহামূল্য গ্যালিয়াস ধাতু চুরি হতে পারে—এই আশঙ্কাতে ভুগছেন বিজ্ঞানীরা। বাজারে এক কিলোগ্রাম গ্যালিয়াস ধাতুর দাম প্রায় ৫০০ মার্কিন ডলার। গঠন অনুযায়ী নিউট্রিনো কণিকাটি আবার তিন প্রকার। ইলেকট্রোনো, ম্যুওন এবং তাউ নিউট্রিনো। এই তিন ধরনের নিউট্রিনো কণিকা, নিজেদের রূপ পাল্টাতে পারে বর্ণচোরা গিরগিটির মতো। যেমন—ইলেকট্রোনো, নিউট্রিনো, নিজের গঠনের অদল বদল ঘটিয়ে ম্যুওন নিউট্রিনো-তে পরিণত হতে পারে। আবার, চতুর্থ ধরনের নিউট্রিনো কণিকার-ও খোঁজ মিলেছে বাকসান পরীক্ষা কেন্দ্রে। সেটি হলো নিরপেক্ষ, বা ''স্টেরাইল'' (Sterile) নিউট্রিনো, সবচেয়ে হালকা পাতলা বস্তুকণিকা হলেও নিউট্রিনো—এই মহাবিশ্বে ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকাদের থেকেও সংখ্যায় অনেকগুলো বেশি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন—মহাবিশ্বে যতগুলি জ্যোতিষ্ক আছে, তাদের মোট ভরের সমতূল্য হলো মহাবিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ কোটি নিউট্রিনো কণিকার সংখ্যা। সম্প্রতি, নিউট্রিনো কণিকাকে নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে মেরুপ্রদেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটা-র হোমস্টেক স্বর্ণখণিতে, জাপানের ইকেনোপর্বত এবং ইতালির গ্রাণ সাসো পর্বতাঞ্চলে।

M. 9547659679

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

কসমেটিক্স সার্জারিতে অভিনবত্ব

নাক ও কানের ইমপ্ল্যান্ট হিসাবে ছাগলের তরুণাস্থির সফল প্রয়োগ

নাক ও কানের সুন্দর গড়ন মুখশ্রীকে এক অন্যমাত্রা প্রদান করে। অন্যদিকে জন্মগত ভাবে বা দুর্ঘটনা জনিত কারণে নাক ও কানের আকৃতি অসুন্দর বা বিকৃত হলে অনেকেই হীনমন্যতায় ভোগেন। এর সমাধানে সাহায্য নেওয়া হয় প্লাস্টিক সার্জারির। বেশির ভাগ সময়ে ইমপ্ল্যান্টের খরচের কথা ভেবে তা আর হয়ে ওঠে না। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন কয়েকজন প্রাণী ও মানুষের চিকিৎসক-গবেষক। ছাগলের কানের তরুণাস্থি ব্যবহার করে যৌথভাবে এঁরা তৈরি করেছেন এমন ইমপ্ল্যান্ট যা একাধারে হবে সস্তা ও সুলভ। রাইনোপ্লাস্টি ও মাইক্রোশিয়া অপারেশনে এই ইমপ্ল্যান্ট আজ দারুণভাবে সফল। ভারত সরকারের জৈব প্রযুক্তি বিভাগের আর্থিক সহায়তায় করা এই গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছয়জন গবেষকের একটি দল।

ইমপ্ল্যান্ট তৈরিতে হঠাৎ ছাগলের কান কেন? এই গবেষণা প্রকল্পে মুখ্য গবেষক অধ্যাপক সমিত কুমার নন্দী এই অভিনব উদ্যোগের কারণ বুঝিয়ে বলেন—আমাদের লক্ষ্যই ছিল এমন জৈব সামগ্রী যা একদিকে হবে সস্তা ও সুলভ, অন্যদিকে শরীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ারহিত। ছাগলের কান যেহেতু মাংস বিক্রির পর ফেলে দেওয়া হয়, তার বাজার মূল্য কম ও এটিকে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অথচ এর তরুণাস্থি কলাকে ব্যবহার করে বায়ো-ইমপ্ল্যান্ট বানানো সম্ভব। কিন্তু ছাগলের কানের তরুণাস্থি মানুষের শরীর নেবে তো? এর উত্তরে এই প্রকল্পের অন্যতম গবেষক অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার এর বিজ্ঞানভিত্তিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'যেহেতু এই ধরনের ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনকে 'জেনোজেনিক' বলা হয়, তাই শরীরে তার গ্রহণযোগ্যতা কম হতে পারে। সেজন্য বিশেষ শোধনব্যবস্থা প্রয়োগ করে আমরা এর বিক্রিয়াশীল অংশকে বাদ দিয়ে নিয়েছিলাম। এরপর গবেষণাগারে সেল কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে এদের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয়। পরে খরগোস এবং কুকুরেও কোনো বিক্রিয়া না হওয়ায় মানুষের শরীরে ব্যবহার করা হয়'। গবেষণাদলের প্লাস্টিক সার্জারীর সার্জন অধ্যাপক রুপনারায়ণ ভট্টাচার্য মানুষের শরীরে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পেরে যারপরনাই খুশী। এই প্রকল্পের সাফল্যে স্বভাবতই খুশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পূর্ণেন্দু বিশ্বাস। তাঁর কথায়, এই গবেষণা ভবিষ্যতে এই ধরনের যৌথ উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করবে। এই কাজটির জন্য পেটেন্টের আবেদন করা হয়েছে, জানালেন অধ্যাপক নন্দী। এই কাজে আরও যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন ড: বিকাশ কান্তি বিশ্বাস, প্রফেসর সুভাশিস বটব্যাল ও শ্রীমতি পিয়ালি দাস। সম্প্রতি এই গবেষণার কাজটি প্রকাশিত হয়েছে 'জার্নাল অফ টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ও রিজেনারিটিভ মেডিসিন' নামক বিখ্যাত আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায়।

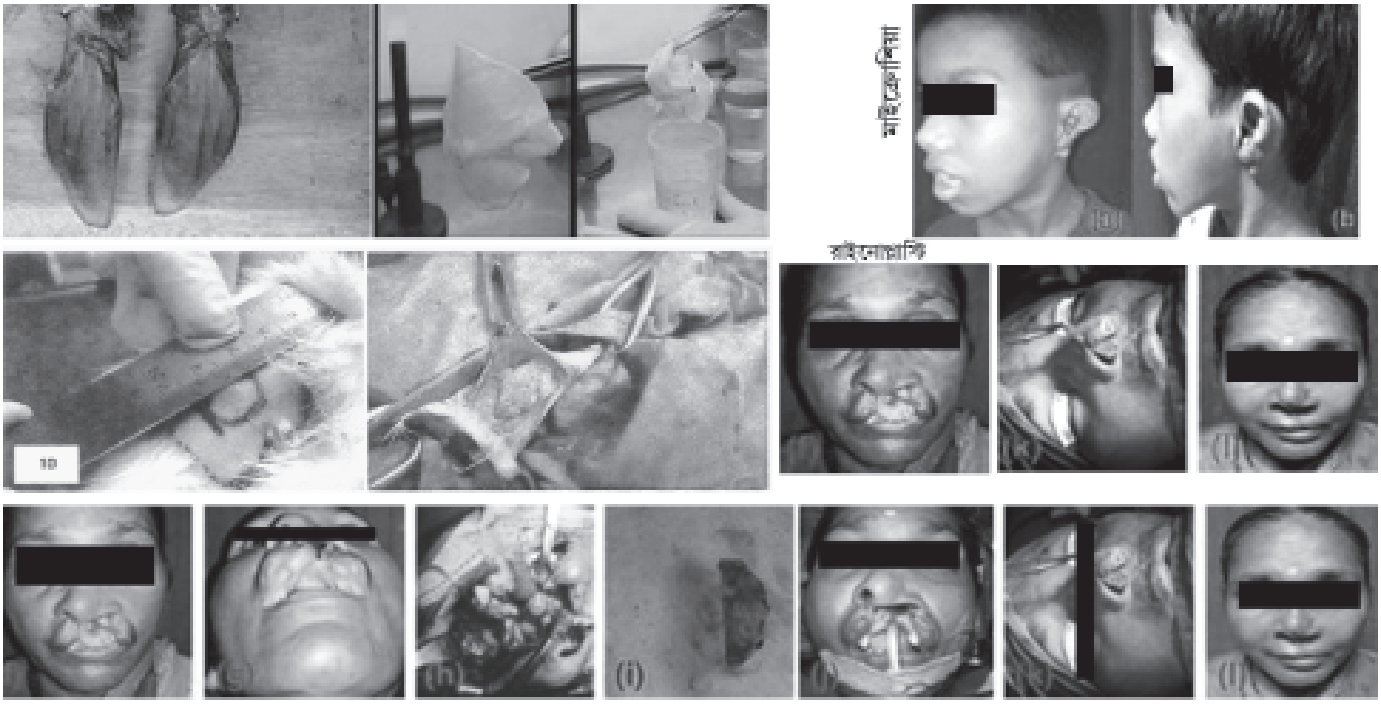

Email : joardar69@gmail.com., M. 9231533335

জগন্ময় মজুমদার

নোবেল বিজয়ে ক্যানসার জয়

প্রায় আপ্তবাক্য হয়ে যাওয়া একটি কথা: Cancer no answer. কিন্তু এবার বোধহয় ঐ আপ্তবাক্যটির দিন ফুরালো। সারা বিশ্বজুড়ে বছরের পর বছর ঘুরে বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে এর একটা উত্তর খুঁজে চলেছেন। অবশেষে পেলেন এই ২০১৮-তে এসে। ক্যানসার প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকরী একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে এ বছর শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসা নোবেল প্রাইজ পেলেন আমেরিকার জেমস পি অ্যালিসন এবং জাপানের তাসুকু হোনজো।

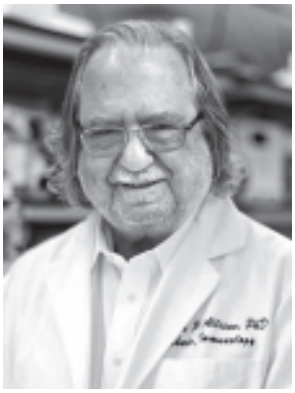

জেমস পি এলিসন

তাসুকু হোনজো

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্যানসারের শিকার হন—মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু ক্যানসার। তাঁরা এর প্রতিরোধকল্পে কি করেছেন সেটা জানার আগে জানা দরকার ক্যানসার আসলে কি। কিন্তু তারও আগে জানা দরকার টিউমার কাকে বলে। আসলে টিউমার হচ্ছে ক্যানসারের পূর্বশর্ত যা আসলে একটি অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি, যে বৃদ্ধির বাড়বাড়ন্ত খুবই বেশি এবং অনিয়ত এবং পরিবর্তনগুলি হয় যে সমস্ত শর্তে, সেগুলি থেমে গেলেও বৃদ্ধি একইভাবে চলতে থাকে অব্যাহত। অবশ্য সব টিউমার থেকে ক্যানসার হয় এমন নয়। যে সমস্ত টিউমার ম্যালিগন্যান্ট শুধু সেগুলিতেই হয়।

এ হেন ক্যানসার প্রতিরোধে আমাদের জন্মগতভাবে প্রাপ্ত সহজাত অনাক্রম্যতার সামর্থ্য বা ক্ষমতাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে তথাকথিত টিউমার কোষকে ধ্বংস করবার জন্য উক্ত বিজ্ঞানী দুজন একদম নতুনতর একটি থেরাপি বা চিকিৎসা পদ্ধতির নীতি প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিজ্ঞানী অ্যালিসন একটি বিশেষ পরিচিত প্রোটিন নিয়ে কাজ করতে করতে দেখেন যে সেটি আমাদের অনাক্রম্য বস্তু (Immune System) একটি ব্রেক হিসেবে অর্থাৎ দুষ্টু কোষগুলির বৃদ্ধিকে থমকে দিতে সাহায্য করছে। প্রোটিনের এই যে ব্রেক তৈরির ক্ষমতা তা আবার টিউমার কোষের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অনাক্রম্য ক্ষমতাবিশিষ্ট কোষকে উদ্দীপ্ত করে। এই বিমূর্ত ধারণা থেকেই তিনি ক্যানসার আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য জন্ম দিলেন পদ্ধতিগতভাবে নতুনতর এক দৃষ্টিভঙ্গি।

সমান্তরালভাবে তাসুকু আবার আবিষ্কার করলেন অনাক্রম্য ক্ষমতা সম্পন্ন কোষের উপরে একটি নতুন প্রোটিন যা আবার ঘটনাচক্রে (অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর) উক্ত ব্রেকের মতই ক্রিয়াশীল। যদিও এর কাজের ধরন আলাদা। তা হোক, 'যত মত তত পথ'—আসলে পৃথিবীর দুই প্রান্তের একজন দূর পশ্চিমের তো আর একজন পূর্বের—এই দুই বিজ্ঞানী দুইয়ে দুয়ে যেন মিলিয়ে দিলেন—অবশ্যই ক্যানসার রয়ে গেল মধ্যবিন্দুতে।

তাঁদের এই পৃথক পৃথক ভাবে করা গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের আলোকে গড়ে উঠতে পারে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার নতুন প্রস্তুতিক্ষেত্র। আসলে অ্যালিসন এবং তাসুকু হোনজো দেখিয়েছেন আমাদের অনাক্রম্যতন্ত্রের উপরে সৃষ্ট ব্রেক দুষ্টু কোষের প্রতিরোধে সক্ষম। অবশ্যই ক্যানসার চিকিৎসা কার্যকরী হবে নিঃসন্দেহে।

ক্যানসার প্রতিরোধে যে সমস্ত পদ্ধতি আছে যথা শল্যচিকিৎসা, তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলি কোনো না কোনো সময় নোবেল প্রাইজও পেয়েছে। এছাড়াও হরমোন চিকিৎসার ফলে বিশেষ করে প্রস্টেট ক্যানসারও ভালো হয়েছে (বিজ্ঞানী হাগিন্স, ১৯৬৩)। ১৯৮৮-তে এলিয়েন এবং হিচিনস কেমোথেরাপির জন্য এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে লিউকেমিয়া অর্থাৎ ব্লাড ক্যানসার নিরাময়ের সূত্রে ১৯৯০-তে নোবেল পেয়েছেন বিজ্ঞানী থমাস। তবুও আরো দুরারোগ্য ক্যানসার চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল অজানা যা হয়ত এতদিনে অ্যালিসন এবং তাসুকু হোনজো আবিস্কার করলেন।

আমাদের অনাক্রমতন্ত্রকে সক্রিয় করে টিউমার কোষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার ধারণাটি অবশ্য উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের শুরুতেই শুরু হয়েছিল। আক্রান্ত রোগীর শরীরে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করিয়ে অনেক চেষ্টা হয়েছে শরীরে একটা সুরক্ষা বলয় সৃষ্টির। এই সমস্ত চেষ্টা ও শ্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের অনাক্রমতন্ত্র যাতে সহজেই চিনে নিতে পারে ক্যানসার কোষকে। কিন্তু এ বড় সহজ কাজ নয়।

আমাদের অনাক্রমতন্ত্রের মৌল ধর্ম হচ্ছে 'NON SELF' থেকে 'SELF' টিকে আলাদা করে অগ্রসরমান জঙ্গি ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণ করে শরীর থেকে বের করে দেওয়া। T-cell হচ্ছে এক ধরনের শ্বেতকণিকা কোষ যারা শরীরের প্রতিরক্ষা ধর্মের মূল চাবিকাঠি। আসলে T-cell-গুলি হচ্ছে মূলত গ্রাহক কোষ যারা উক্ত NON SELF কাঠামোকে বেঁধে রাখে, ফলত এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের অনাক্রমতন্ত্রের প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে উস্‌কে দেয়। কিন্তু এর পেছনে আছে কিছু প্রোটিন যেগুলি T-cell এর ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। দেশ বিদেশের হাজারো বিজ্ঞানী এই প্রোটিন সনাক্তকরণের কাজে এখনো লিপ্ত আছেন যারা দেখতে চাইছেন কিভাবে ঐ প্রোটিনগুলি প্রয়োজনে ব্রেক এবং উসকে দেওয়ার কাজটি করে। এর ভারসাম্যের উপরেই নির্ভর করছে ক্যানসার কোষের নিয়ন্ত্রণ।

গত শতাব্দীর নয়ের দশকে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবোরেটরিতে জেমস পি অ্যালিসন CTLA-4 নামক একটি T-cell প্রোটিন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এই সূত্রে তিনি একটি অ্যান্টিবডি তৈরি করলেন যেটি CTLA-4-কে বেঁধে ফেলতে পারে এবং নিস্ক্রিয় করে। তারপর তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন CTLA-4 ব্লকেড T-cell

ব্রেককে থমকে দিয়ে ক্যানসার কোষের বিরুদ্ধে আক্রমন করার উপযোগী হয়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালের শেষে ক্যানসার আক্রান্ত ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা করে তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা অভূতপূর্ব সাড়া পেলেন। পরবর্তীকালে ২০১০ সালে 'মেলানোমা' নামক একটি ত্বক ক্যানসারের চিকিৎসায় তার পদ্ধতি বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়।

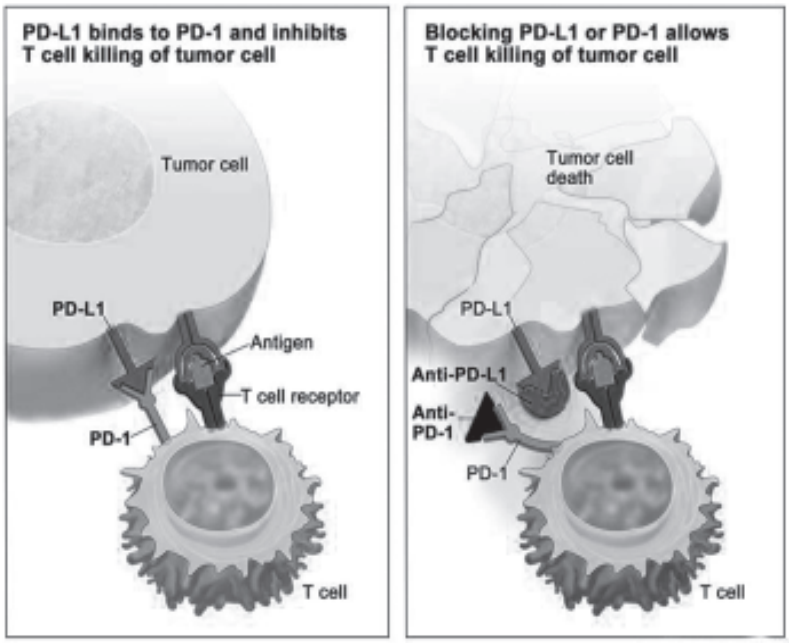

এদিকে আবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে জাপানের কিয়াটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানী তাসুকু হোনজো PD-1 নামে একটি প্রোটিন আবিষ্কার করে ফেলেছেন যা কিনা T-cell এর উপরে ক্রিয়াশীল। PD-1, CTCA-4 এর মত T-cell-এ ব্রেকের মত কাজ করে। করলে কি হবে এর কাজের কৌশলটি আলাদা। যতই আলাদা হোক বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার নিরাময়ে একদম অব্যর্থ। মেটাস্ট্যাটিক ক্যানসার যা এতদিন দুরারোগ্য বলে চিহ্নিত ছিল, এই পদ্ধতির প্রয়োগে তাও সম্পূর্ণ আরোগ্যযোগ্য এখন।

CTLA-4 এবং PD-1 ব্লকেড এর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তথা ফলাফলের ভিত্তিতে সৃষ্টি হওয়া 'Immune Check point therapy' ক্যানসার চিকিৎসায় এখন একটি মাইলফলকের মত পদ্ধতি। যদিও নতুনতর চিকিৎসা গবেষণায় CTLA-4 এবং PD-1-কে টার্গেট করে যে 'Combination Therapy'-র কথা শোনা যাচ্ছে তা আরো বেশি আরোগ্যসক্ষম। বিশেষ করে ফুসফুস ও বৃক্কের ক্যানসারে, লিম্ফোমা ও মেলানোমায় এই পদ্ধতি সর্বাংশে সফল।

একদিন হয়ত এই 'Immune Check point therapy' এবং 'Combination therapy' ক্যানসার জয়ের শ্রেষ্ঠতম আয়ুধ হয়ে উঠবে। মানুষের পরমায়ু আরো একটু বাড়বে নির্ঘাৎ।

M. 9432523890

তপন দাস

যুগোপযোগী রসায়ন

মানুষের চাহিদার যেন অন্ত নেই। কখনো ভোগ বিলাস জীবন যাপনের লক্ষে, কখনো পৃথিবীকে সবুজায়িত করতে, কখনো দ্রুত গতিতে কোথাও পৌঁছাতে বা কখনো দ্রুত আরোগ্য লাভের তাগিদে মানুষের চাওয়া পাওয়ার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আর তা মেটাতে শিল্প কারখানার মালিকেরা ছুটে চলেছে বিজ্ঞানের দরবারে। কড়া নাড়ছে রসায়নের পরীক্ষাগারে। সকলের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রসায়নের দিকপাল ব্যক্তিবর্গ লেগে পড়েন অনুগুলোকে আরো নতুন ভাবে সাজাতে। খুঁজতে থাকেন আরো উন্নততর রসায়ন।

ফ্রান্সিস এইচ আরনোল্ড

জর্জ পি স্মিথ

গ্রেগরী পি উইন্টার

ডারউইনের তত্ত্বে আমরা পড়েছি যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন, আবার কখনো পড়েছি পরিবেশে টিঁকে থাকার সংগ্রামের কথা। যেমন করে ২৭ লক্ষ কোটি বছর আগে প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও পৃথিবীর কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রতিটি জীব অনবরত লড়াই করে চলেছে নিজেদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত করার জন্য। যেমন লাইকেন পার্বত্য হিমালয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আবার জেলিফিস জ্বলে ওঠে গভীর সমুদ্রের তলদেশে। আর এই কথাগুলোকে মাথায় রেখেই ২০১৮-র রসায়নের তিন নোবেল জয়ী ফ্রানসিস এইচ আরনোল্ড, জর্জ পি স্মিথ এবং গ্রেগোরী পি উইন্টার এমন কতগুলি ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যা সমগ্র মানব জাতিকে তাদের পরিবেশে অভিযোজিত করতে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠা জীবনের রসায়নে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে জিন। যার ক্রমাগত স্বল্প পরিবর্তনও জীবনের রসায়নকে যে অনেকটা পরিবর্তন করতে পারে এটা খুব ভালো বুঝেছিলেন ফ্রান্সিস এইচ আরনোল্ড, যিনি সুইডিশ একাডেমির ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৮-র নোবেল পুরস্কারের অর্ধাংশের দাবিদার। ফ্রানসিস

এইচ আরনোল্ড, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপিকা যিনি মেকানিক্যাল বিভাগে স্নাতক হয়েও তিনি পরবর্তী পড়াশুনা এবং অধ্যাপনা শুরু করেন রসায়ন ও জৈবরসায়নে। তাঁর

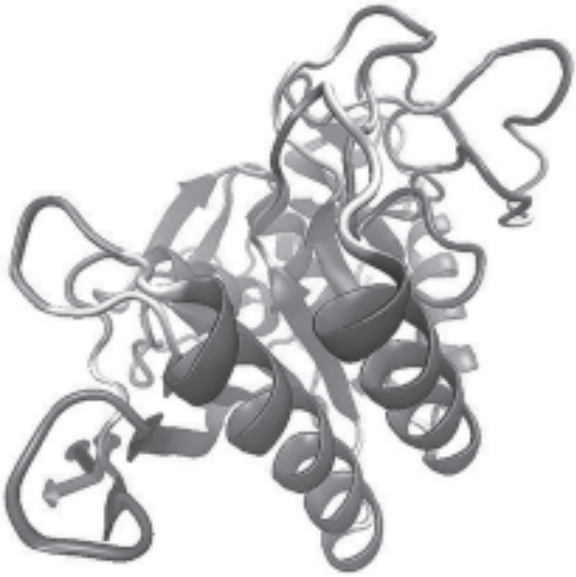

সাবস্টিলিসিন এস ৪১

যুগান্তকারী উৎসেচকের আবিষ্কার যা পরিবেশ বান্ধব রাসায়নিক উৎপাদনে, উন্নত ঔষধ উৎপাদনে এমনকি পুনঃনবীকরণযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনে সহায়তা করবে। আরনোল্ড তার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন কাজের প্রতিটি ধাপেই। তিনি চেয়েছিলেন কিভাবে সৌরশক্তিকে আরো বেশি করে কাজে লাগিয়ে বিকল্প শক্তির সন্ধান দেওয়া যায়। তিনি বুঝেছিলেন রসায়নের গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু পথ দেখানো। যে কাজের জন্য নোবেল শিরোপা তার মাথায় উঠেছে সেটি হল নতুন উৎসেচক সাবস্টিলিন এর আবিষ্কার। আমরা জানি একটি উৎসেচক যেমন হাজার হাজার অ্যামাইনো অ্যাসিডকে যুক্ত করতে পারে এবং তার ভিন্নতাও থাকে অনেক অনেক। ডাইমিথাইল ফর্মামাইড এই উৎসেচক বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এটি দুধে উপস্থিত ক্যাসিন-এর প্রোটিনকে

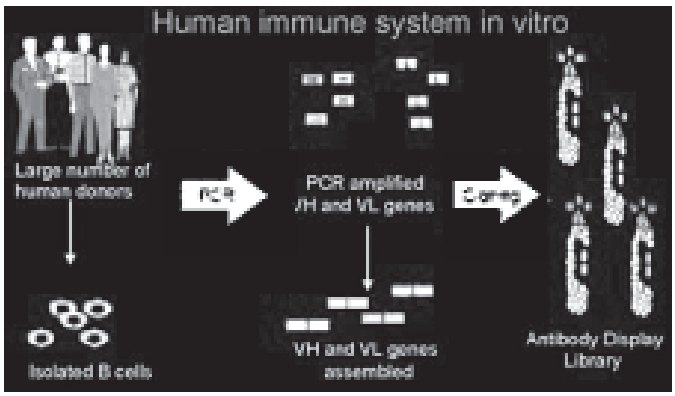

পরীক্ষাগারে মানব ইমিইনো পদ্ধতি

ভাঙ্গতে সক্ষম। আবার এটি সরল সুগারকে আইসোবিউটান্যালে রূপান্তর করতে সক্ষম। এই আইসোবিউটান্যাল পরিবেশ বান্ধব প্লাসটিক ও জৈব জ্বালানী প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

বাকি অর্ধাংশের যুগ্ম দাবিদার হলেন জর্জ পি স্মিথ এবং গ্রেগোরী পি উইন্টার। জর্জ পি স্মিথ ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবহার না করে কিভাবে দেহের জৈব বিষক্রিয়াগুলিকে নষ্ট করা যায় তার এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন। সরাসরি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেহের অনাক্রম্যতা বাড়িয়ে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি এমনকি মেটাস্ট্যাটিক ক্যানসারের মত রোগকেও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। মিশৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক নতুন ভাবে প্রোটিনকে বিকশিত করার যে পদ্ধতির কথা বলেছেন তা তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে স্মিথ একটি জানা প্রোটিনের থেকে অজানা জিনের ক্লোন গঠন করেন। এই ব্যাকটেরিওফ্যাজ গঠন এক ধরনের হাইজ্যাক করার মত ঘটনা। দ্বিতীয় ধাপে এই ব্যাকটেরিওফাজের পৃষ্ঠতলে একটি ক্যাপসুল প্রোটিন গঠন করা হয়। তৃতীয় ধাপে স্মিথ পেপটাইডের সাথে যুক্ত থাকা একটি অ্যান্টিবডির নকশা গঠনে সক্ষম হন। স্মিথের এই ধারণার বাস্তবিক প্রয়োগ বহুলাংশে সফল।

গ্রেগোরী পি উইন্টার স্মিথের ধারণাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য ইঁদুরের পরিবর্তে সরাসরি মানুষের অ্যান্টিবডি নিয়ে কাজ করেছেন, কারণ মানুষের অনাক্রম্যতা অনেক বেশি। ক্যামব্রিজের এম আর সি ল্যাবরেটরি অব মলিকুলার বায়োলজির অধ্যাপক তাঁর গবেষণায় বুঝতে পেরেছিলেন দেহে থাকা বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া যখন কোনো অ্যান্টিবডির সাথে যুক্ত হয় ঠিক তখনই অনাক্রমতা তন্ত্রে একটি নির্দেশ পাঠায় রোগকে প্রতিহত করার জন্য। আমরা জানি অ্যান্টিবডি খুবই সুনির্দিষ্ট ভাবে অন্যের সাথে যুক্ত হয়। তাই তিনি ফাজ উপস্থাপন পদ্ধতিই বেছে নিয়েছেন অ্যান্টিবডি উৎপাদনে। একটি ছোট অনুর সাথে অ্যান্টিবডিকে যুক্ত করেন এবং তার নাম দেন ফক্স যা দেখতে অনেকটা হুকের মত। মানুষের অ্যান্টিবডি থেকে প্রস্তুত করা বিশ্বের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যালের আবিষ্কার বলা চলে তারই হাত ধরে। তার আবিষ্কৃত ফার্মাসিউটিক্যাল এডালিমুমাব অ্যান্টিবডি যা টি এন এফ আলফা গোত্রের প্রোটিনকে প্রশমিত করতে পারে। ২০০২ সালে এই অ্যান্টিবডি রিউমটয়েড আরথ্রাইটিসের নিরাময়ে ব্যবহারের স্বীকৃতি পায়, যা পরে অনেক পেটের রোগ নিরাময়েও ব্যবহার করা হয়। অ্যানথ্রাক্স-এর মতো ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাপ্ত বিষকে প্রশমিত করতে পরবর্তী কালে এই পদ্ধতিতেই আবিষ্কৃত হয় অপর অ্যান্টিবডি যা লিউপাস রোগকে প্রতিহত করতে সক্ষম।

সবশেষে বলা যায় এই তিন বিজ্ঞানীর যুগান্তকারী আবিষ্কার নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের এক নতুন দিশা দেখাবে। এই পথে অনেক ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণাধীন আছে, অচিরেই সেগুলি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যায়।

Email : tdcob25@gmail.com., M. 9434686749

রতন দেবনাথ

নোবেল পেল লেজার আলো

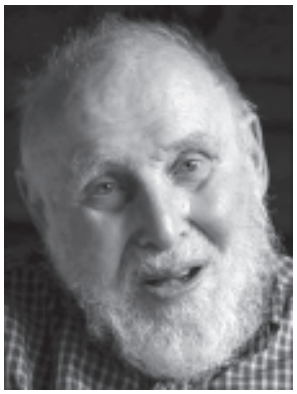

আর্থার অস্কিন

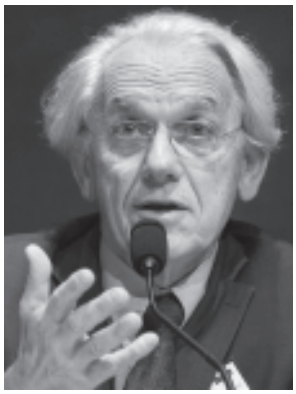

জেরার্ড মুরু

ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড

ছোট্ট পিকু মেলা থেকে একটা খেলনা কিনেছে। টর্চ লাইটের মতই খানিকটা। তবে ছোট। সুইচ টিপলেই বেড়িয়ে আসে লাল আলো। চলে যায় অনেক দূর। দিনের আলোতেও স্পষ্ট সেই আলো। ভারী সুন্দর। দোকানদার কাকু খেলনাটার নাম বলে দিয়েছে লেজার লাইট। বন্ধুদেরও সে দেখিয়েছে খেলনাটা। পিকু আর তার বন্ধুরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে লেজার লাইট থেকে বেড়িয়ে আসা আলো কিন্তু টর্চের থেকে বেড়িয়ে আসা আলোর মত নয়। টর্চের আলো যত দূরে যায় তত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লেজার লাইট থেকে বেড়িয়ে সেই আলো যাচ্ছে একেবারে সোজা নাক বরাবর। একটুও ছড়াচ্ছে না এদিক ওদিক। কৌতূহলের অন্ত নেই ওদের।

লেজার

পিকুর খেলনার সাথে যুক্ত লেজার কথাটা আজকাল প্রায় সবার মুখেই শোনা যায়। তা সে চক্ষু অপারেশনের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হোক অথবা লেজার শো এর আলোর রোশনাই এর দৌলতেই হোক। আলোর বিবর্তনের পথে লেজার হল একটি ধাপ। সর্বাধুনিকও বটে। ফিলামেন্ট বাতি বা টিউবলাইট ইত্যাদি আলোর উৎসের আধুনিকতম উত্তরসূরী।

ফিলামেন্ট বাতিতে আলোর সৃষ্টি ধাতব তারের। সাধারণত টাংস্টেন। উচ্চ তাপমাত্রায় উন্নীতকরণের ফল। সরু তারের ফিলামেন্টে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তারটি প্রচন্ড গরম হয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে। বেরিয়ে আসে আলো। ফ্লুরসেন্ট বাতি টিউবলাইট। গঠনগত ভাবে একটু আলাদা ধরনের। এখানে কাচের নলের ভিতরে প্রলেপ দেওয়া থাকে জিঙ্ক সালফাইড-ক্যাডমিয়াম সালফাইড সংমিশ্রণে তৈরি ফসফরাসের। অল্প চাপে কাচনলে ভরা থাকে সামান্য পারদ বাষ্প। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উত্তেজিত পারদের পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে অতি বেগুনী কিরণ, ফসফরাসের সাথে সংঘাতে তাকে করে তোলে উজ্জ্বল। বেরিয়ে আসে দুধ সাদা আলো।

গঠনগত পার্থক্য যাই থাকুক, ফিলামেন্ট বাতিই হোক আর ফ্লুরসেন্ট বাতিই হোক আলো সৃষ্টির মূল কারণ একই। এমনকি দেশলাই কাঠি জ্বালালে যে আলো হয়, তাও ঠিক একই কারণে। পদার্থের পরমাণু বা অণু বাইরের শক্তির প্রভাবে উত্তেজিত বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে পরমাণু বা অণু থেকে বেরিয়ে আসে আলোর কণা বা ফোটন। আর সে আলোর প্রকৃতি নির্ভর করে কোন পদার্থ থেকে তা বেরিয়েছে তার উপর। যেমন পদার্থটি যদি হাইড্রোজেন হয় তবে আলোর রং হবে লাল, সোডিয়াম হলে তার রং হবে হলদে। সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পে যেমন দেখা যায়।

ফিলামেন্ট বাল্ব

পদ্ধতি যাই হোক আলোর বিকিরণ সর্বদাই হয়ে থাকে কণিকার আকারে। যার নাম ফোটন। এক এক উত্তেজিত পরমাণু বা অণু থেকে যে ফোটন বেরিয়ে আসে তারা পরস্পর নিরপেক্ষ। এক একটি ফোটনের শক্তি হয় এক এক রকম। এরকম বিকিরণে মিশে থাকে বিভিন্ন বর্ণের আলো। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যার নাম ইনকোহেরেন্স। সব ফোটনই যদি একই শক্তির হত তাহলে সেই আলো হত নির্ভেজাল এক রং-এর। এরকম অবস্থাটি পরিচিত কোহেরেন্স নামে। লেজার আলো উৎপাদনে এই কোহেরেন্স ব্যাপারটিকেই কাজে লাগানো হয়।

লেজার (LASER-Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) আলোর দুনিয়ায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অণু বা পরমাণু থেকে নির্গত কিকিরণও যে কোহেরেন্ট হতে পারে তা বোঝা গেছে লেজার আবিষ্কারের পরেই। পদার্থের অণু বা পরমাণু

উত্তেজিত অবস্থায় যে আলো বিকিরণ করে তা ফোটন সর্বস্ব। নির্গত ফোটনের প্রকৃতিই আলোর প্রকৃতি নির্ধারণ করে। উপযুক্ত পদার্থ (Active Medium) নির্বাচন করে নিয়ন্ত্রিত ফোটন সৃষ্টি মাধ্যমে তৈরি করা যেতে পারে প্রায় আদর্শ কোহেরেন্ট আলো। যা করা হয় লেজার-এ।

১৯৬০ সালের ১৬ মে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এবং পদার্থবিদ থিওডোর হেরল্ড মাইম্যান এর হাতে মুক্তি পায় বিশ্বের প্রথম কোহেরেন্ট আলো লেজার। একবর্ণিতা, অভিমুখীনতা এবং তীব্রতায় যা অদ্বিতীয়। প্রয়োগের ব্যাপকতাও যার অপরিসীম। বারকোড স্ক্যানার থেকে শুরু করে ডিভিডি প্লেয়ার, লেজার প্রিন্টার, হলোগ্রাম দৈনন্দিন জীবনের এরকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার প্রয়োগ দেখা যায় আকছার। এছাড়া

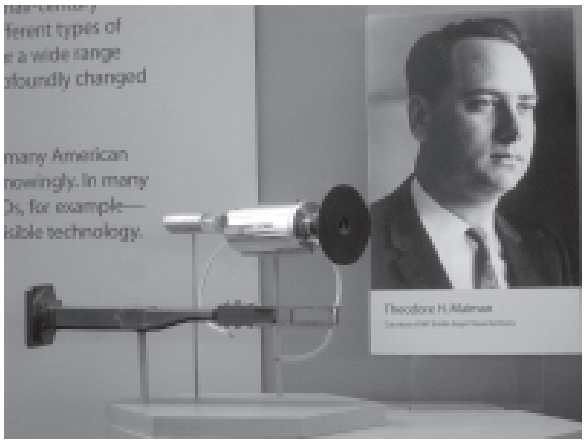

মাইম্যান ও তাঁর লেজার যন্ত্র

টেলি-যোগাযোগে ফাইবার অপটিক ব্যবস্থায় লেজার এর প্রয়োগ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শল্য চিকিৎসায় বিশেষ করে চোখের অপারেশনেও লেজার-এর ভূমিকা অনবদ্য।

২০১৮ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হল লেজার সংক্রান্ত গবেষণার জন্য। লেজার আলোকে চিমটার মত কাজে লাগিয়ে ধরা যেতে পারে অণু, পরমাণু এসব ক্ষুদ্র জগতের সদস্যদের। এমনকি ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জীবজগতের এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সদস্যদেরও টুঁটি চেপে ধরে তাদের নিয়ে করা যেতে পারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এরকমই এক কাজের জন্য নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক পেলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী আর্থার অস্কিন। বাকি অর্ধেক পেলেন ফরাসি বিজ্ঞানী জেরার্ড মুরু এবং তাঁর সহকারি কানাডার পদার্থবিদ ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। মুরু এবং স্ট্রিকল্যান্ড এর কাজ কি ছিল? ক্ষুদ্রতম এবং তীব্রতম লেজার পালস (Laser Pulse) আবিষ্কার যার সাহায্যে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ চোখের অপারেশন হচ্ছে।

সূর্যের আলো শক্তির আধার। আলো এবং তাপ এই দুই ধরনের শক্তিই পাওয়া যায় সূর্য থেকে। দিনের বেলা সূর্যের ঝলমলে আলোয় দৃশ্যমান হয় সব বস্তু। রোদে দাঁড়ালে অনুভূত হয় গরম। কিন্তু এমনটা কখনও মনে হয় না যে গায়ে আলো পড়লে তা ধাক্কা দিচ্ছে। অর্থাৎ যান্ত্রিক কাজ করার ক্ষমতা আলোর নেই। আলোকে যান্ত্রিক কাজে লাগানো যায় কিনা এ ভাবনা চাগাড় দিত আর্থার অস্কিনের মাথায়। আলো ফেলে বস্তুকে সরানো যায় কিনা একসময় স্বপ্নও দেখতেন আর্থার। সুযোগ এল ১৯৬০ সালে লেজার আবিষ্কারের পর। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন লেজার নিয়ে। একবর্ণী এবং তীব্র একমুখী লেজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে যে সরাতে পারবে এরকম একটা দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন আর্থার। সত্যিই তাই। অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রোমিটার আকারের) স্বচ্ছ গোলকে লেজার আলো ফেলে তিনি দেখলেন সত্যিই তা লেজার আলোর পথ বরাবর এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়। গোলকগুলো চলার পথে যেন ক্রমশ চলে আসছে লেজার আলোকগুচ্ছের কেন্দ্রস্থলে। যেন কেউ ঠেলে ঠেলে তাদের এনে ফেলছে কেন্দ্রস্থলে। আসলে ব্যাপারটা হল এরকম লেজার আলোর তীব্রতা মাঝের দিক থেকে শুরু করে ধারের দিকে কমতে থাকে। বিকিরণ চাপ বাড়তে থাকে ঠিক উল্টোভাবে। অর্থাৎ ধারের দিক থেকে মাঝের দিকে। এই বিকিরণজনিত চাপই কণাটিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে মাঝ বরাবর। কণাটি আটকে পড়ে লেজার ফাঁদে। উপযুক্ত ক্ষমতায় লেন্সের সাহায্যে লেজার আলোকে একটা কেন্দ্রবিন্দুতে ফেলে কণাটিকে ধরাও যায় চিমটার মত। যেন এক আলোকীয় চিমটা।

বিগত কয়েক বছরে অস্কিনের এই আবিষ্কারকে হাতিয়ার করে মানব কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ হয়েছে লেজার চিমটায়।

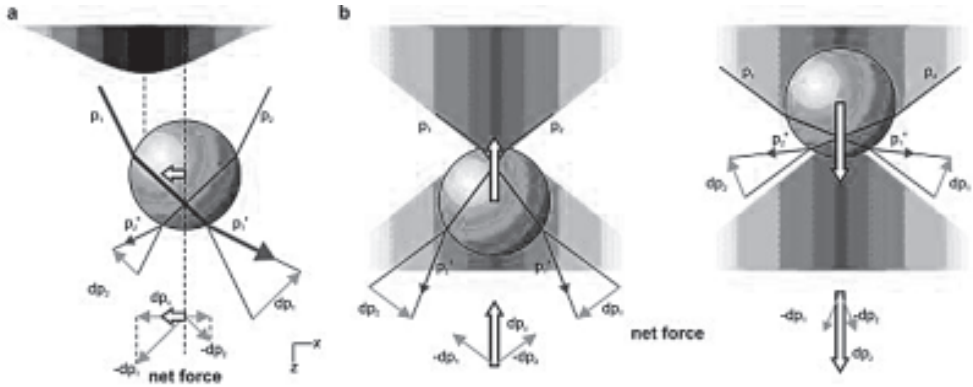

আলোকিত টুইজারে বলের কার্য

বছর ষাটেক আগে লেজার আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীদের নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল কি করে বাড়ানো যায় এক একটা লেজার তরঙ্গের তীব্রতা। অবশেষে এল সেই সফলতা। ১৯৮৫ সালে জেরার্ড মরু এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী মহিলা পদার্থবিদ ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড চার্পড পালস অ্যাপ্রিফিকেশন পদ্ধতিতে আবিষ্কার করলেন ক্ষুদ্রতম অথচ তীব্র লেজার তরঙ্গ। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তথা শিল্পক্ষেত্রে যার অসামান্য প্রয়োগ মানবজীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে চোখ অপারেশনে যার প্রয়োগ সফল অস্ত্রোপচারের এক নিদর্শন।

Email : rdebnath1961@gmail.com., M. 9477934928

শিবপ্রসাদ পাল

ফেকো ও ডাক্তার কেলম্যান

চোখের ইন্ট্রাঅকুলার লেন্স প্রতিস্থাপন এক যুগান্তকারী অপারেশন। স্যার হ্যারল্ড রিডলী যিনি প্রথম এই অপারেশন করেন তাঁর কথা আগে লিখেছি। এরপর যিনি আরও এগিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তিনি ডা: চার্লস ডেভিড কেলম্যান। জন্ম ব্রুকলিন নিউইয়র্কে ১৯৩০ সালে। কি সেই ভাবনা? ডা: রিডলী সমস্ত ছানিকে বাইরে এনে তারপর লেন্স প্রতিস্থাপন করতেন। ডা: কেলম্যান ভাবলেন যদি ছানি বাইরে না এনে চোখের ভিতরেই সরানো যায় তবে আরো ভাল হয়। তখন বড় করে চোখ কাটার দরকার হবে না। লেন্সকে ফোল্ড করে ভিতরে দেওয়া যাবে। এর ফলে খুব কম পরিমাণ কেটে ছানি অপারেশন করা যাবে। ভাবলেন তো বটে কিন্তু উপায় কি। মানে কি পদ্ধতিতে টুকরো করে ছানি বের করবেন।

ডা: কেলম্যান দাঁতের চিকিৎসার জন্য গেলেন ডেন্টিস্ট-এর কাছে। চেয়ারে বসলেন। ডেন্টিস্ট ডা: কেলম্যানের দাঁতের ফাঁকে জমা পাথর বা টার্টর (Tartar) পরিষ্কার করার জন্য হাই ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেটিং ডিভাইস যাকে সংক্ষেপে আমরা ড্রিলমেশিন বলি, ব্যবহার করছিলেন। তখনই ডা: কেলম্যানের মাথায় আইডিয়া আসল। উনি চেয়ার থেকে উঠে চেম্বার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসলেন। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন আমি পেয়ে গেছি, আমি পেয়ে গেছি। উনি ভাবলেন দুটি দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা পাথর যদি এই ড্রিল মেশিনের সাহায্যে পরিষ্কার করা যায় তবে ছানিকেও এই পদ্ধতিতে টুকরো করা যাবে। দিনের শেষে তিনি ডেন্টিস্ট এর চেম্বারে ফিরে এলেন সঙ্গে ছানি নিয়ে। সেই ছানি হাতের উপর রেখে ওই মেশিন দিয়ে কেটে গ্রুভ বা লাইন তৈরি করলেন। আস্তে আস্তে পুরো ছানিকেই তিনি এভাবে টুকরো করতে পারবেন এই চিন্তা করলেন।

এই প্রাথমিক ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে অনেক পরিশ্রম আর বিনিদ্র রাত কাটাতে হয়েছে। প্রোব বা শলাকার মাথায় আলট্রাসাউন্ড ওয়েভ পাঠিয়ে শক্ত ছানিকে ছোট ছোট টুকরো করে জলের সাহায্যে চোখের ভিতর থেকে বাইরে আনলেন। এই পদ্ধতিকে উনি বললেন ফেকো ইমালশিফিকেশন। ফেকোস অর্থাৎ ছানি। ইমালশিফাই মানে টুকরো করে জলের সাহায্যে বাইরে আনা অর্থাৎ ফেকো অপারেশন, সংক্ষেপে চলতি ভাষায় আমরা বলে থাকি। ক্যাভিট্রন এর বড় ফেকো মেশিনের সাহায্যে ১৯৬৭ সালে প্রথম অপারেশন করাতে ছিয়াত্তর মিনিট লেগেছিল। এখন সেই অপারেশন পনেরো মিনিটে করা হয়। এরপর মেশিন ও প্রোবের অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে হালকা মোটা পেনের মত হ্যান্ড প্রোব ব্যবহার করা হয়।

১৯৭৩ সালে ওয়েলস ক্যাটার‍্যাক্ট সার্জিক্যাল কংগ্রেস-এ তাঁর এই পদ্ধতি নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছিল। তিনি ম্যালপ্র্যাকটিস অর্থাৎ নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন বলা হয়েছিল। এমনকি ফেরবার পথে ওনার সামনে থুতু ছিটোনোর মত ঘটনা ঘটেছিল। যদিও সেইসব

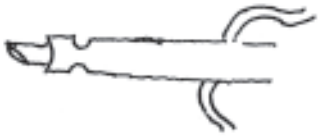

ফেকো প্রোবের ছবি

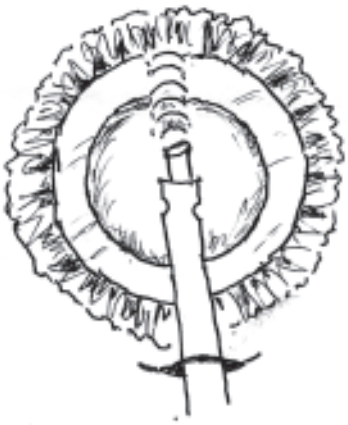

ফেকো প্রোবের সাহায্যে ছানিতে গ্রুভ তৈরি করা হচ্ছে

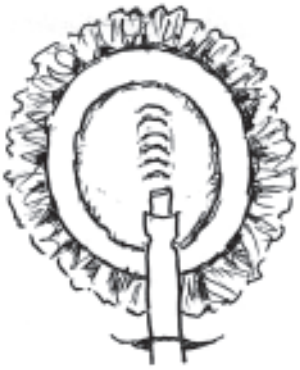

ডাক্তারদের অনেকেই পরে তার এই পদ্ধতিতে অপারেশন শুরু করেছিলেন। সেই সময় মাত্র এক শতাংশ সার্জেন ফেকো করতেন। খুবই ধীর গতিতে ফেকো অপারেশন গ্রহণযোগ্য হল। ১৯৭৮-৮১ এই বছরগুলিকে ট্রানজিশন পিরিয়ড বা পরিবর্তনের সময় বলে গণ্য হল। নয় দশকের প্রথমে তাঁর এই পদ্ধতি স্বীকৃতি পেল। অবশেষে তাঁর এই কাজের জন্য ১৯৯২ সালে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ন্যাশনাল মেডেল অফ অপথ্যালমলজি পুরস্কার তুলে দিলেন ডা: চার্লস ডেভিড কেলম্যানের হাতে।

M. 9433564719

শৈবাল কুমার গুহ

মৃত্যু উপত্যকার উদ্ভিদ

মরুবাসী উদ্ভিদ প্রসঙ্গে উত্তর আমেরিকায় মৃত্যু উপত্যকা (Death Valley)-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুগ যুগ ধরে আশেপাশে পাহাড়-পর্বত থেকে প্রচুর লবণ-জাতীয় পদার্থ বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে এসে উপত্যকার নিচে জমা হয়েছে। প্রখর সূর্যকিরণে জল সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। মৃত্যু উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পড়ে আছে অসংখ্য লবণের কেলাস। সূর্যের আলোয় যেগুলি অনবরত ঝলমল করছে। কোনরকম উদ্ভিদের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই মৃত্যু উপত্যকা ঘিরে চারপাশে উদ্ভিদের সমারোহ বেশ নজরে পড়ে।

মরু-প্রান্তরে কোন সমতল ভূমির উদ্ভিদ সাধারণত দেখা যায় না। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট সবুজ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের ঝোপ-ঝাড়। এদের মেসগাইটস্ বলে। মরুভূমিতে জল থাকে মাটির অনেক নিচের স্তরে। মেসগাইটদের মূলতন্ত্র ৩০ ফুট থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, যাতে তারা মাটির নিচের স্তর থেকে জল সংগ্রহ করতে পারে। কান্ড বেশি উন্নত হয় না। সে তুলনায় মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যাতে প্রয়োজনীয় জল সহজেই সংগ্রহ করতে পারে।

এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে সাধারণ গাছের মতই, তবে এদের বীজে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। যখন আবহাওয়া শুষ্ক থাকে তখন তাদের বীজগুলো সুপ্ত থাকে। বৃষ্টিপাত যদি আধ ইঞ্চির বেশি হয়, তবেই এদের বীজগুলো অঙ্কুরিত হয় নতুবা নয়। মাটির নিচে থেকে জল পেলেও এদের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। উপর থেকে বৃষ্টিপাত হলে তবেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, বীজের বহিঃত্বকে অঙ্কুরোদ্গম রোধক কোন পদার্থ (যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড) থাকে, তা বৃষ্টিপাতের ফলে দ্রবীভূত হয়ে নিচে নেমে যায়। ফলে অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয়।

এই জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে বসন্তকালে ফুল ফোটানো বা বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এইজন্য আগে নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হলে তবেই এইসব বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়, নতুবা নয়। লক্ষ করে দেখা গেছে যে, অসময়ে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হলেও বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। তার কারণ, তখন সেই অঙ্কুরিত উদ্ভিদের পক্ষে যথেষ্ট সময় বেঁচে থেকে ফুল ফোটানো এবং বীজ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই মনে হয়, এইসব উদ্ভিদের এমন অভিযোজন হয়েছে যে, সময়মতো বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করেই তারা বীজের অঙ্কুরোদ্গম নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

মৃত্যু উপত্যকার উদ্ভিদের মধ্যে অদ্ভুত এক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দেখা যায়। যেটুকু জল এরা পায় সমস্ত প্রকার মরুবাসী উদ্ভিদ তা মিলেমিশে ভাগ করে নেয়। সমস্ত উদ্ভিদগুলি এক জায়গায় হয়। তাদের বৃদ্ধি সীমিত হয়। তাদের একটিমাত্র ফুল ফোটে, একটিমাত্র বীজ সৃষ্টি হয়। এইভাবে তারা জায়গা, আলো, খাদ্য এবং জল সমবন্টনের মাধ্যমে ভাগ করে নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বেঁচে থাকে। কেউ কাউকে ধ্বংস করে না। এ এক বিচিত্র সহাবস্থান।

ক্রিয়োসেটে ঝোপ (Creosate bush) উত্তর আমেরিকার মরু অঞ্চলে পাওয়া যায়। ব্রিটল ঝোপ পাওয়া যায় দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার মরু অঞ্চলে। এরা একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ বার করে, ফলে কাছাকাছি অরণ্য গাছ জন্মাতে পারে না। নানা জাতীয় ক্যাকটাসে খুব সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে।

উত্তর আমেরিকার মরু অঞ্চলে পাওয়া যায় বিয়ার গ্রাস। এর পাতাগুলি খুব সরু, অগ্রভাগ খন্ডিত, ফুলগুলিও খুব ছোট। এর অপর নাম স্প্যানিশ বেয়োনেট। মরুভূমির দেশে পান্থপাদপ নামের গাছ সুমিষ্ট জল সঞ্চয় করে। মরুভূমির পথের তৃষ্ণার্ত পথিকেরা এই গাছ থেকে সেই জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। মালাশাসি দ্বীপে (মাদাগাস্কার) পাওয়া

যায় রভোনালা মাদাগাস্কারেনসিস। এই গাছ থেকে পাওয়া যায় সুস্বাদু পানীয়।

উত্তর আমেরিকার 'সাগুয়ারো' নামে একরকম ক্যাকটাস জন্মায়, তার ভেতর কয়েক গ্যালন জল জমে থাকতে পারে। দেখে মনে হবে, যেন একটা সবুজ রঙের লাঠি মাটিতে পোঁতা আছে। সামান্য দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই, আবহাওয়া আর্দ্রতা সামান্য একটু বাড়লেই হল, সঙ্গে সঙ্গে এরা জল আহরণ করতে শুরু করে। এদের শিকড়গুলোও এই কাজের উপযোগী। কারণ শিকড়গুলো মাটির গভীরে না গিয়ে মাটির উপরিতলের কাছাকাছি থেকেই অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বাতাস ও মাটির জলীয় অংশ উবে যাওয়ার আগেই এরা নিজের শরীরে টেনে নিয়ে জমিয়ে রাখে। কিন্তু প্রচন্ড উত্তাপে এই গাছের গা থেকে জল উবে যায় না কেন? সেটাও প্রকৃতির এক

আশ্চর্য কান্ড। এদের গায়ে পরানো থাকে বর্ম। মোমের মত একরকম আঠালো পদার্থ শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে যায়। মোমের এই আস্তরণটা একেবারেই তাপ-পরিবাহী নয়। ফলে বাইরের তাপ ভেতরে আসতেই পারে না। মোমের এই চাদর গায়ে জড়াতে জড়াতে এরা সমস্ত শরীরকে একটু একটু করে সইয়ে নিতে থাকে। তাই এদের বৃদ্ধি এত কম যে, একটা গাছ পুরো লম্বা হতে একশো বছর লেগে যেতে পারে।

সাগুয়ারো থেকে পাওয়া যায় একপ্রকার ফল যা রেড-ইন্ডিয়ানদের প্রিয় খাদ্য। ফল থেকে এরা সিরাপও তৈরি করে। বীজ থেকে তৈরি করে মাখন। অরগ্যান পাইপ ক্যাকটাস, ফণিমনসার ফলও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বোলা সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ফণিমনসা জলে রাখলে তার থেকে লাল রঙ বেরোয়। জেলি এবং জিলোটিন রঙ করতে একে ব্যবহার করা হয়। রেড-ইন্ডিয়ানরা ক্যাকটাসকে ঘর তৈরিতে কাজে লাগায়।

মোমের বর্ম পরার কৌশলটা মরুভূমিতে এতই উপযোগী যে, ক্যাকটাস ছাড়া অন্য ধরনের গাছগুলোও তা ক্রমশ আয়ত্ত করে নিচ্ছে। উত্তর আমেরিকার মরুভূমিতে 'ক্যানডেলিয়া' নামে একরকম প্রজাতির গাছ পাওয়া গেছে, তাদের গায়ে একটুও পাতা নেই। কিন্তু পাতাবিহীন লম্বা ডালগুলোতে লেপটে থাকে মোমের আস্তরণ। রোদ্দুরে এই আস্তরণটা বেশ চকচক করতে থাকে। ফলে ভেতরের জলীয় অংশ তো বেরোতেই পারে না, তারপর চকচকে গায়ে রোদ্দুর প্রতিফলিত হওয়ার জন্য দেহের ভিতরে উত্তাপও অনেক কম ঢুকতে পারে। বসন্তের শেষে আর গ্রীষ্মের প্রাক্কালে, কমলা-লাল রঙের ফুল ফুটিয়ে এরা যেন 'মেরু বিজয়ের কেতন' ওড়ায়।

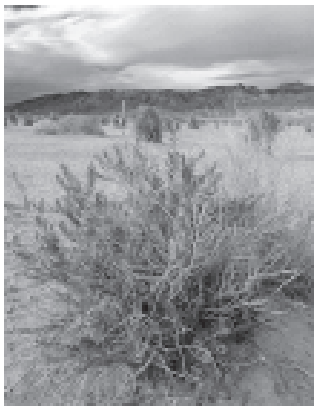

তাই বলে পাতাওলা গাছ মরুভূমিতে দেখতেই পাওয়া যায় না, তা নয়। তবে এইসব পাতার কারিকুরি একটু আলাদা। ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকে 'বুজাস' আর 'অকোটিলাস' গাছ। এদের ডালগুলো দেখতে অক্টোপাসের পায়ের মত। শাখা-প্রশাখা খুব কম, বড়জোর গোটাকয়েক। যেই বাতাসে আর্দ্রতা একটু বাড়ে তখনই ডালপালাগুলোর গায়ে ছোট ছোট পাতা গজিয়ে ওঠে। এই সময় সালোক সংশ্লেষের কাজকর্ম পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। তারপর গরমকালের আভাস দেখা দিলেই পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে পড়তে শুরু করে। পাতার বোঁটাগুলো এমনভাবে ঝরে পড়ে যে, ডালের গায়ে একটুখানি সরু সুঁচালো অংশ আটকে থাকে, যা ক্রমশ শক্ত কাঁটায় পরিণত হয়। যখন সব পাতা খসে যায়, তখন গাছের স্বাভাবিক কাজকর্ম খুবই কমে যায়। ফলে এই নিষ্ক্রিয় অবস্থান জীবনীশক্তি জোগাবার ইন্ধন অনেক কম লাগে। অর্থাৎ, আর্দ্রতার সময় পাতাগুলো যে খাদ্য ও জল আহরণ করে রাখে, তা খুব সামান্য পরিমাণে খরচ হতে থাকে।

তাছাড়া পাতায় বোঁটা খসে যাওয়ার জায়গায় যে ছিদ্র তৈরি হয়, তাও বন্ধ করে দেয় মোমজাতীয় রস। তাই অত্যধিক গরমেও গাছের শরীরের জলীয় অংশ উবে বা শুকিয়ে যেতে পারে না। গ্রীষ্মকাল শেষ হলেই আবার আরম্ভ হয় যাবতীয় কাজকর্ম এবং শুরু হয় সাদা সাদা

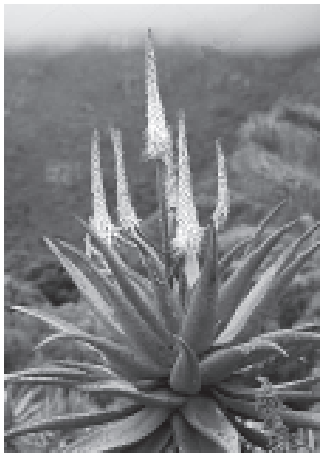

ফুল ফোটানোর পালা।

আফ্রিকান মরুভূমিতে 'অ্যালো' গাছের পাতার আকৃতিও খুব বড়। কিন্তু এরা পাতা খসায় না। কারণ, প্রকৃতি এই পাতাগুলোকে এমনভাবে গড়েপিঠে নিয়েছে, তাতে তারা রুক্ষতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এগুলো সাধারণ গাছের পাতার মত হালকাও নয়, আর সহজে ছেঁড়াও যায় না। হাত দিলে মনে হবে যেন রবার বা চামড়া দিয়ে তৈরি। করাতের মত পাতার ধার এমনই খাঁজকাটা যে, অসাবধানে হাত দিলেই হাত ছড়ে যেতে পারে।

M. 9038896221

ম নো তো ষ মি ত্র

পরিমিতির সূত্র—গর্ভ

আজ সাত সকালেই পাপান এসে হাজির। বলল স্যার কেমন আছেন? বললাম—ভাল। তুমি? এই প্রশ্নের উত্তরে পাপান একটু হেয়ালি করেই বলল—গণিত বা অঙ্ক যখন মুখস্থ করে শিখতে হয় তখন কি কারও মন ভাল থাকে স্যার। বুঝলাম—পাপানের নতুন কিছু ক্ষিদে আছে। মাথা চুলকে বলল স্যার মাধ্যমিকের পরিমিতি অংশের বৃত্তের পরিধি, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, চোঙের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বা আয়তন; শঙ্কুর আয়তন বা গোলকের আয়তন নির্ণয়ের জন্য ফর্মূলা ব্যবহার করেই অঙ্ক করেছি। কিন্তু ফর্মূলাগুলো এল কিভাবে? বলেই পাপান খাটের উপর উঠে বসল। বুঝলাম আজ আর ছাড় নেই। বললাম—বোসো। সব একে একে বলব। প্রথমেই বলব বৃত্তের বেড়া বা পরিধির কথা। পরিধি নির্ণয়ের তিনটি পদ্ধতির কথা বলব।

প্রথম পদ্ধতি : ধরি, 0 কেন্দ্র এবং r একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করতে হবে। π এর সংজ্ঞানুযায়ী,

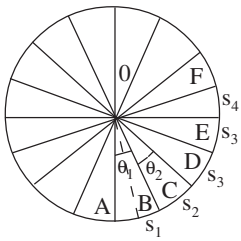

চিত্র (A)

$\pi =$

বা, $\pi =$

বা, $S = 2\pi r$

$\therefore$ বৃত্তের পরিধি $= 2\pi \times$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ

দ্বিতীয় পদ্ধতি : আবার ত্রিকোণমিতির প্রথম পাঠ থেকে আমরা জানি যে, s দৈর্ঘ্যসম্পন্ন চাপ যদি r একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রে θ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করে তাহলে

[s = r হলে তাকে 1 রেডিয়ান বলে]

একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে 360° বা 2π রেডিয়ান ঘোরা হয়। অতএব θ এর স্থলে 2π বসালে পাই

$2\pi =$ বা $s = 2\pi r$

$\therefore$ বৃত্তের পরিধি $= 2\pi r$

এই দুটি প্রমাণ দেখে পাপান খুব উৎসাহিত। বলল—আর কোন প্রমাণ হয় না। এর উত্তরে বললাম—দ্বিতীয় পদ্ধতিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেখানো যেতে পারে। যেমন চিত্র (A)-তে গোটা বৃত্তটিকে AOB, BOC, COD—ইত্যাদি অজস্র সেক্টরে বিভক্ত করে নেওয়া হল। AB, BC, CD.....চাপের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে s_1, s_2, s_3.....হলে এবং s_1, s_2, s_3.....চাপ কেন্দ্রে θ_1, θ_2, θ_3,.....কোণ উৎপন্ন করলে সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

এবার প্রত্যেকটি কোন যুক্ত করলে পাই :

$$\theta_1,\ \theta_2,\ \theta_3,.... = \frac{s_1}{r} + \frac{s_2}{r} + \frac{s_3}{r} + ...$$

$$\text{বা } \theta = \frac{s_1 + s_2 + s_3 + ...}{r}$$

বা $2\pi = \frac{s}{r}$ বা $s = 2\pi r$

$\therefore$ বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য $= 2\pi r$ একক

পাপান খুব খুশী। বলল তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের ফর্মূলা কিভাবে এল? পাপানের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—বলছি শোন।

এবার বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় পদ্ধতি :

প্রথম পদ্ধতি : দেখো পাপান ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মূলাতো তুমি জান। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\times$ভূমি$\times$উচ্চতা।

লেখা শেষ হতেই পাপান বলে উঠল স্যার এটাই বা কোথা থেকে এল। বুঝলাম পাপান আজ ঘট পূর্ণ না করে বাড়ি ফিরবে না। বললাম—একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য$\times$প্রস্থ।

আবার আয়তক্ষেত্রের কর্ণ আয়তক্ষেত্রকে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে। যেমন চিত্র (B)-তে ABCD একটি আয়তক্ষেত্র। AC ত্রিভুজ ΔABC ও ΔACD-তে বিভক্ত করেছে।

$\therefore$ arΔABC = arΔACD = দৈর্ঘ্য$\times$প্রস্থ। [ar = area (ক্ষেত্রফল)]

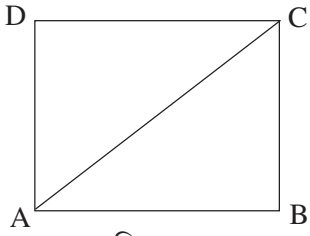

চিত্র (B)

এক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য AB হল ΔABC এর ভূমি ও প্রস্থ BC হল উচ্চতা।

$= \Delta ABC =$ $\times$ভূমি$\times$উচ্চতা।

পাপানের সব মনে পড়ে যাওয়ায় খুব খুশী হল। বলল এবার বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রের উৎপত্তির কথা বলুন। ওই কথায় আবার শুরু করলাম। বললাম ফিরে যাও ঐ চিত্র (A)-তে। OAB সেক্টরে ΔOAB এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব ত্রিভুজের ফর্মূলা নিয়ে। AB জ্যা-এর উপর কেন্দ্র থেকে h লম্ব টেনে নিলাম।

$\therefore \Delta AOB =$ $AB \times h$.

বৃত্তের অভ্যন্তরে ΔAOB এর মতো অজস্র ক্রমিক ত্রিভুজ রচনা করলে ত্রিভুজগুলির মোট ক্ষেত্রফলই হবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল। এবং উচ্চতা হয়ে উঠবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ। তবে অজস্র ত্রিভুজ আঁকতে হবে।

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = (AB×h+ BC×h+ CD×h+.....n সংখ্যক)

= (AB+BC+CD+.....2 সংখ্যক)×h.

= (বৃত্তের পরিধি)×r [$\eta \to \alpha$ হলে h = r হবে]

= $\times 2\pi r \times 4 = \pi r^2$ বর্গ একক।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : চিত্র (A)-কে প্রতি ব্যাস বরাবর কেটে ফেললে যে টুকরোগুলো পাওয়া যাবে সেগুলির কেন্দ্রমুখ পরপর বিপরীতমুখী করে সাজালে একটি আয়তক্ষেত্র PQRS পাওয়া যাবে। গোটা পরিধি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের রূপ দিয়েছে। দৈর্ঘ্য PQ = πr একক, প্রস্থ QR = r একক।

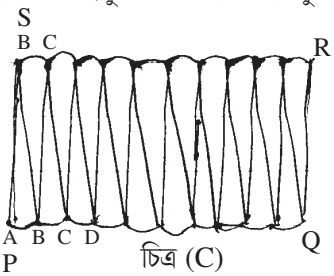

চিত্র (C)

$\therefore$ PQRS এর ক্ষেত্রফল = বৃত্তের ক্ষেত্রফল।

= দৈর্ঘ্য×প্রস্থ = $\pi r \times r = \pi r^2$ বর্গ একক।

পাপানের সন্দিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম ও কি ভাবছে। বললাম—বুঝেছি তুমি কি ভাবছো। AB চাপকে কিভাবে সরলরেখা ভেবে নেওয়া হচ্ছে তাই তো? শোনো এই ত্রিভুজের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে বক্রতা ক্রমশঃ সরলরেখায় রূপান্তরিত হবে। পাপান একটু চোখ বন্ধ রাখল। তারপর চোখ খুলে বলল—হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। বললাম—ঠিক আছে। এবার তৃতীয় পদ্ধতি দেখ।

তৃতীয় পদ্ধতি : সমকেন্দ্রিয় বা এককেন্দ্রিয় বৃত্তের ধারণা প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যাবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল। বাড়িতে দড়ির বৃত্তাকার পাপোষ তৈরির কৌশলে একই কেন্দ্র ও ভিন্ন ব্যাসার্ধের কতকগুলি বৃত্তকে এমনভাবে ঘন সন্নিবেশ করা হল যাতে তার ভিতর কোন ফাঁক না থাকে। চিত্র (D)-তে দেখান হল কিছু এককেন্দ্রিয় বৃত্ত। OA রেখা বরাবর সেটি কেটে ফেলা হল। প্রতিটি টুকরোর দৈর্ঘ্য হল নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের পরিধি। এবার প্রতিটি দড়ির টুকরোকে দড়ির দৈর্ঘ্যের উর্ধ্বক্রমে এমনভাবে সাজানো হল যাতে দড়িগুলোর একটি প্রান্ত তুমি সমতলের উপর একটি রেখায় থাকে। যেমন চিত্র (E). এক্ষেত্রে AB = r বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং BC = $2\pi r$ বৃহত্তম দড়ির দৈর্ঘ্য বা পরিধি।

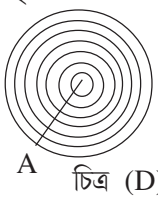

চিত্র (D)

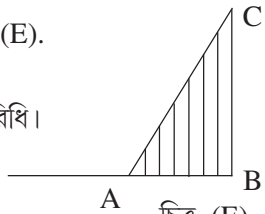

চিত্র (E)

$\therefore \Delta ABC = \quad \times AB \times BC$

$= \quad \times r \times 2\pi r = \pi r^2$ বর্গ একক।

ΔABC এর ক্ষেত্রফল = বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 বর্গ একক। পাপান খুব খুশী হল। পাপানকে আরও খুশী করার জন্য বললাম—আরও একটা পদ্ধতি দেখ।

চতুর্থ পদ্ধতি : ত্রিভুজের ধর্মকে ব্যবহার করে।

চিত্র (A)-তে ধরি O কেন্দ্র ও r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের ভিতর η ($\to \alpha$) সংখ্যক ত্রিভুজ অঙ্কন করা হল। η সংখ্যক ত্রিভুজের যে কোনও একটির ক্ষেত্রফল = $\times B \times C \sin \angle AOB$।

$= \quad \times r.r.\sin\theta$ [এক্ষেত্রে $b = c = r$]

$= \quad r^2 \sin\theta$ $\angle AOB = \theta$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = η সংখ্যক ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$= \eta \times \quad \sin\theta$ যখন $\eta \to \alpha$ (infinitive)

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = যেহেতু $\eta\theta = 2\pi$

= ধরি $\eta = {}^1/_y \therefore y \to 0$

$$= \lim_{y \to 0} \eta \cdot \frac{r^2}{2} \cdot \sin\frac{2\pi y}{y}$$

$$= \frac{r^2}{2} \text{ wt}_{y \to 0} \frac{\sin 2\pi y}{2\pi y} \times 2\pi$$

$= \quad \times 2\pi = \pi r^2$ বর্গ একক।

পাপান শুধু খুশীই হয়নি একেবারে আনন্দে ডগমগ। বলল—তাহলে চোঙের আয়তন আর বক্রতলের ক্ষেত্রফলটাও একটু বলে দিন। বললাম—ধর r একক ব্যাসার্ধ বৃত্ত অঙ্কন করলাম। তার ক্ষেত্রফল কত?

$$\lim_{\eta \to \alpha} \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\eta} \cdot \frac{r^2}{2} \sin\frac{2\pi}{\eta}$$

পাপান বলল পরিধি = $2\pi r$ একক ক্ষেত্রফল = πr^2 বর্গ একক।

আমি বললাম একদম ঠিক। তাহলে বল কত উঁচু ড্রাম বা চোঙ চাও? উচ্চতাকে h ধরে পরিধির পাশে বসালে চোঙের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পাবে। আর ক্ষেত্রফলের পাশে h বসালে চোঙের আয়তন পাবে। যেমন তোমার মায়ের কাঁচের চুরি একটার পর একটা সাজিয়ে তুললে একটি চোঙ খুঁজে পাবে। তাহলে কি দাঁড়াল। চোঙের আয়তন = বৃত্তের ক্ষেত্রফল×h = $\pi r^2 h$ ঘন একক।

চোঙের বক্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = বৃত্তের পরিধি×h = $2\pi rh$ বর্গ একক। পাপান খুব খুশী। বলে ফেলল—তাহলে শঙ্কু আর গোলক বাদ থাকে কেন? ঐ দুটোও একটু ছুঁয়ে দিন। সারাজীবনের মতো সংগ্রহে রাখবো। বললাম—বৃত্ত থেকে যেমন চোঙ পাওয়া গেল। চোঙ থেকেই উৎপত্তি শঙ্কুর। একই ব্যাসার্ধ ও উচ্চতার শঙ্কুর আয়তন চোঙের আয়তনের এক তৃতীয়াংশ। একই ব্যাসার্ধ ও উচ্চতা বিশিষ্ট একটি শঙ্কু ও একটি চোঙ নিয়ে জলপূর্ণ করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। চিত্রেও তা অনুভব করা যায়। চিত্র (F)-এ একটি চোঙ থেকে তিনটি শঙ্কুর ছাঁচ বের করা খুব কঠিন কি?

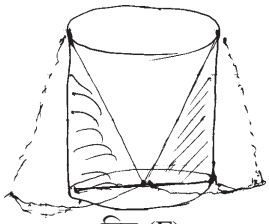
চিত্র (F)

তাহলে শঙ্কুর আয়তন = ×চোঙের আয়তন

= $\pi r^2 h$ ঘন একক

পাপান খুব খুশী হল। বলল—তাহলে গোলকের আয়তন বলে দিলেই বাড়ি চলে যাব। বললাম—ঠিক আছে শোন। বলে একটি গোলক আঁকলাম। চিত্র G, এরপর AB এবং CD রেখা বরাবর গোলকটি (তরমুজ) কেটে ফেললাম। OAB অংশ একটি শঙ্কু আকৃতির হবে। কি হবে তো? তরমুজের উদাহরণ দেওয়ায় পাপান খুব দ্রুত বুঝল। বলল—হ্যাঁ সার। চার বন্ধু একটি গোলাকার তরমুজ ভাগ করে খেলে যা হয়। তাই না স্যার। বললাম---ঠিক ধরেছো। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, প্রতিটি খন্ডের আকার প্রায় শঙ্কুর মত।

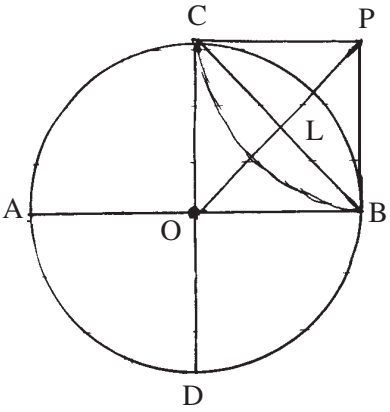

চিত্র (G)

তাহলে 1টি শঙ্কুর আয়তন = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ঘন একক

4টি শঙ্কুর আয়তন = $4\times\ \pi r^2 h$ ঘন একক

গোলকের আয়তন = $\pi r^2 h$ ঘন একক

চিত্র (G)-তে OB = OC = গোলকের ব্যাসার্ধ।

আবার BOC শঙ্কুর ভূমিতলের বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদের ব্যাসার্ধ = BL = LC = r (ধরি) এবং শঙ্কুটির উচ্চতা = OL = h (ধরি)

OBPC বর্গক্ষেত্রের উপর পরস্পরকে সমদ্বিখন্ডিত করে = OL = BL $\therefore$ h = r.

$\therefore$ গোলকের আয়তন = $\pi r^2 h$

= $\pi r^2 r$ [h = r বসিয়ে]

= πr^3 ঘন একক

পাপান খুবই খুশী হবে বলে উঠল—এত সোজা তবু N.C.E.R.T. বা S.C.E.R.T. আজও এর প্রমাণ দিল না—এটাই দুঃখের। এর উত্তরে বললাম এই তত্ত্বটি 2003 সালে রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে দিয়েছি। নথিভুক্তি হয়েছে। স্বীকৃত হয়েছে। তবুও কোন পরিবর্তন নেই। এই সামান্য প্রমাণগুলো হাতের কাছে থাকলে গাণিতিক যুক্তি আরও ধারাল হয়ে ওঠে। এককথায় পাপান স্বীকার করে প্রণাম করে বাড়ির পথে অগ্রসর হল।

M. 9734695094

বিজয় সরকার

জানো কি?

লাল রং দেখলে ষাড় রেগে যায় কেন?

স্পেন এবং আরও কয়েকটি দেশে ষাড়ের লড়াই খুব জনপ্রিয় খেলা। খেলোয়ার, দর্শকদের মধ্যে তা নিয়ে বিরাট উত্তেজনা। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে, যা আজও বদলায়নি। ধারণাটি হল, লাল রং ষাড়কে রাগিয়ে তোলে। আর তাই বুলফাইটার ষাড়ের সামনে একটি লাল কাপড় মেলে ধরে ষাড়ের উত্তেজনা তৈরি করে। কিন্তু যদি হলুদ, কালো, সবুজ বা সাদা রঙের কাপড় ব্যবহার করা হত, তাহলে কী ঘটত? ষাড়টির আচরণ একই থাকত, সে একইরকম রেগে যেত। কারণ ষাড় বর্ণান্ধ, রঙের প্রভেদ সে করতে পারে না। তাই যদি হয়, তাহলে ষাড়ের এমন আচরণের কারণ কী? এর কারণ রঙ নয়। ষাড়টিকে আগে থেকেই নানা ভাবে বিরক্ত, ক্ষিপ্ত করে রাখা হয় যে তার সামনে তখন ফুলের তোড়া ধরলেও সে একই ভাবে বুলফাইটারের দিকে তেড়ে যাবে।

শীতকালে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হয় কেন?

শীত যখন বেশ জাঁকিয়ে পড়ে, তখন বাতাসের উষ্ণতা বেশ কমে যায়। আমাদের শরীর ভেতরের উষ্ণতা কিন্তু তখনও বাইরের পরিবেশের থেকে অনেক বেশি থাকে। নাক মুখ দিয়ে আমরা যে বাতাস ছাড়ি, তাতে থাকে অসংখ্য জলকণা। শীতকালে হা করে বাতাস বের করলে শরীরের ভেতরকার গরম জলীয়বাষ্প বাইরের ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। আর জলকণাগুলি জোট বেঁধে ধোঁয়ার আকার নেয়। এই ঘটনা সাধারণতঃ সকাল ও রাতেই ঘটে, যখন ঠান্ডার প্রকোপও বেশি। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে এমনটা আর ঘটে না।

Email : bijoysarkar4786@gmail.com., M. 9432335882

অমিতাভ চক্রবর্তী

নতুন গবেষণার অলিন্দে

হার্ড ডিস্কের ক্ষমতা বাড়াতে আনবিক মেমরি ব্যবহারের ভাবনা

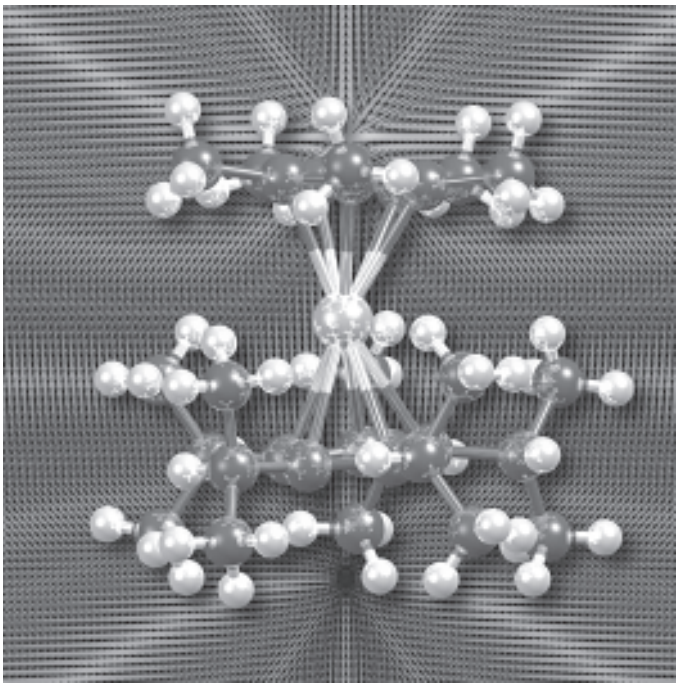

নতুন ডিসপ্রোসিয়াম যৌগ

আনবিক চুম্বক আসলে এমন সব অণু যারা কোনো নির্দিষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র প্রত্যাহারের দীর্ঘসময় পরেও সেই চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ মনে রাখতে পারে। এই ধর্মকে কাজে লাগিয়ে অণুগুলিতে কোনো তথ্য লিখে রাখা যেতে পারে। তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর ছাড়াও হাই ডেনসিটি ডিজিটাল স্টোরেজ মাধ্যমগুলিতেও এদের সম্ভাব্য ব্যবহার রয়েছে। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। আসলে এইসব আনবিক চুম্বকেরা অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রাতেই অর্থাৎ প্রায় পরমশূন্য তাপমাত্রার (-২৭৩°C) কাছাকাছি কেবলমাত্র কর্মক্ষম। তবে সম্প্রতি ফিনল্যান্ডের জায়ভাসকিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আশার আলো দেখাচ্ছেন। তাঁরা এমন এক ধরনের আনবিক চুম্বক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন যা তরল হিলিয়ামের চেয়ে (-১৯৬°C) বেশি উষ্ণতায় চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ মনে রাখার কাজটি করতে পারে। এর নাম দেওয়া হয়েছে উচ্চতাপমাত্রার এক আনবিক চুম্বক। ওনাদের তৈরি ডিসপ্রোসিয়াম মেটালোসিন যৌগটি তরল নাইট্রোজেনের আবহে কার্যকরী। যদিও স্বাভাবিকের তুলনায় এই তাপমাত্রা অত্যন্ত কম, তা সত্ত্বেও দামের দিক থেকে তরল হিলিয়ামের চেয়ে প্রায় ৩০০ ভাগ সস্তা তরল নাইট্রোজেন ইতিমধ্যেই প্রযুক্তিবিদ্যাসহ গবেষণার অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই গবেষকদলের অন্যতম সদস্য আকসেলি মানসিক্কামাইকিও তাদের তৈরি এই এক আনবিক চৌম্বকীয় পদার্থটির সফল প্রযুক্তিগত প্রয়োগ নিয়ে আশাবাদী।

এত জল কি করে এলো?

সেই ছোটবেলাকার পাঠ্যবইতে পড়ানো হয় একদা জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড পৃথিবী, হাজার হাজার বছর ধরে ঠান্ডা হয়ে কঠিন অবস্থায় এসে শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎসহ বর্ষার যুগ। ভূত্বকের নীচু অঞ্চল ভরে ওঠে জলে। তৈরি হয় সাগর-মহাসাগর। কিন্তু ভাবলে সত্যি বিস্ময় লাগে যে আমাদের বাসভূমি এই গ্রহটিতে এত জল এলো কি করে? ভূত্বকের প্রায় ৭১ শতাংশ স্থান জলমগ্ন। আর পরিমাণের নিরিখে পৃথিবীর মোট জলের ৯৬.৫ শতাংশ রয়েছে সাগর বা মহাসাগরের বিপুল জলরাশি হিসাবে। তবে এই জানা তত্ত্ব হয়তো খুব শীঘ্রই পাল্টে ফেলতে বাধ্য হব আমরা। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে পৃথিবীর এই জল এসেছে সৌরমন্ডলের গ্যাসীয় অংশ থেকে, যা সূর্যের জন্মের পর

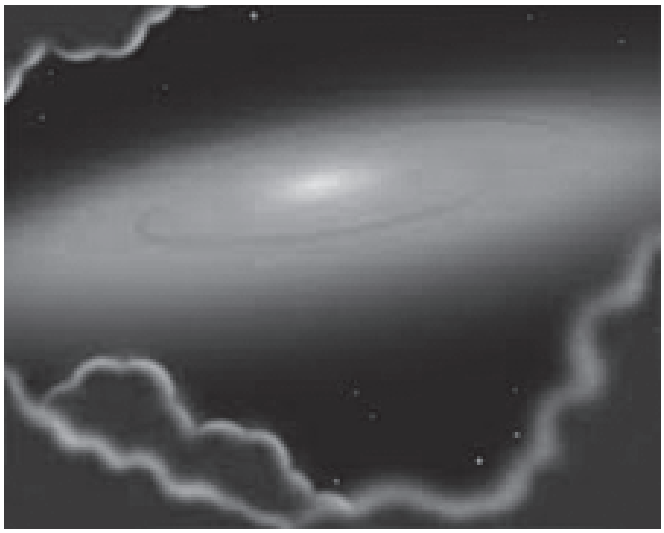

সোলার নেবুলা

অবশিষ্ট হিসাবে ছড়িয়ে ছিল। তাছাড়া বরফ সমৃদ্ধ ধূমকেতুগুলিও এই জলের উৎস হিসাবে ভাবা যেতে পারে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই দুই গ্যাসীয় মৌলের সংযুক্তিতে তৈরি হয় জল। গবেষকদলের অন্যতম অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পিটার বাসেকের কথায় সূর্য সৃষ্টির পরবর্তী সময়ে সৌরজগতে অবশিষ্ট ধুলোর মেঘ, যাকে 'সোলার নেবুলা' বলা হয়ে থাকে, সেইটিই আসলে হাইড্রোজেনের বিরাট উৎস। এই হাইড্রোজেন সেই সৃষ্টির আদিকালের ভীষণাবস্থায় ভূত্বকের কঠিন অংশের (যেখানে বিভিন্ন অক্সাইড হিসাবে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে) সাথে যুক্ত হয়ে জলে পরিণত হয়েছে। এই তত্ত্ব সত্যিই সৌরমন্ডলের বাইরেও পৃথিবী সদৃশ গ্রহের অস্তিত্বের ভাবনাকে উসকে দেয়। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৮০০টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, যেগুলি অন্য একাধিক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং যাদের মধ্যে অনেকগুলিরই ভূপৃষ্ঠ ও পরিবেশ প্রায় আমাদের পৃথিবীর মতোই।

Email : acnbu13@gmail.com., M. 9434377067

প্র বী র ব সু

মুক্ত চিন্তক এবং বিজ্ঞান মনস্ক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য নোবেল জয়ী সাহিত্যিক। সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি অঙ্গনেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। কিন্তু সেই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল অদম্য আগ্রহ। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং যুক্তিবাদী মন তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল। জগদানন্দ রায়, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত সহ বহু অনুসন্ধিৎসু মানুষকে তিনি শান্তিনিকেতনে নিয়ে এসেছিলেন। বাল্য এবং কৈশোরের পারিবারিক প্রভাব মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংকলন 'বিশ্ব পরিচয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করে ভূমিকায়

তিনি বলেছিলেন, 'আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নয় সে কথা সত্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রসস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার তখন বয়স নয়-দশ বছর, মাঝে মাঝে রবিবারে আমাদের বাড়িতে আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাশয়। তিনি প্রায়ই বিজ্ঞানের কিছু কিছু সাধারণ তত্ত্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। আমার মন তাতে বিশেষভাবে পুলকিত হত। আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে ওপরে ওঠে আর ওপরের ঠাণ্ডা ভারি জল নিচে নামতে থাকে, জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুড়োর সাহায্যে স্পষ্ট করে দিলেন—এই বিস্ময়ের স্মৃতি আজও আমার মনে আছে।' ব্রাহ্ম পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে, বালক রবীন্দ্রনাথের মন থেকে ধর্মীয় সংস্কার প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ছেলেবেলা এবং জীবন স্মৃতি গ্রন্থে পাই তাঁর ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে নরকঙ্কাল নিয়ে অস্থিবিদ্যা শেখার কথা।

ছেলেবেলা গ্রন্থে 'বারান্দার এক কোণে, ঝাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে আতার বিচি পুঁতে তার থেকে কচি পাতা বেরোবে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করত। নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটেনি'-ঝাঁট দিয়ে সব ধুলো সাফ করায় বালক রবির আশা পূরণ হয়নি।

বারো বছর বয়সে পিতার সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে গ্রহ, নক্ষত্র চিনে নেওয়া, শুধু চেনা নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষপথের দূরত্ব মাপা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিচরণ আমি জেনেছি। সেই সব কথা শুনে মনে রেখে কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

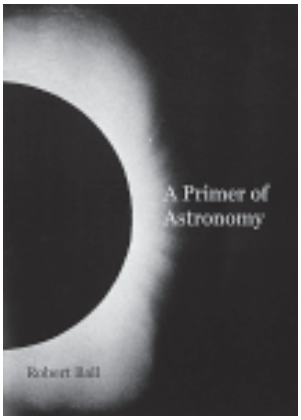

বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে ধারাবাহিক রচনা। (ভূমিকা : বিশ্বপরিচয়)।

তিনি লিখেছেন, 'সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়িনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। সার রবট্ বল-এর বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। তারপর এক সময় সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিয়েই আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিল্প বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।'

ভাবুক প্রকৃতির কবি স্বভাবের মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক। সত্য দৃষ্টির প্রতি বিশ্বাসী একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। ১৯০৪ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশ আলোড়িত হয়। রবীন্দ্রনাথও গানে বক্তৃতায় এই আলোড়নকে প্রবল করে তোলেন। কিন্তু এই আন্দোলন কালে গঠনমূলক স্বদেশ চর্চার প্রস্তাব করে ব্যর্থ হলে চলে যান নিজের জমিদারির কেন্দ্র শিলাইদহে। যেখানে তরুণদের উৎসাহ দিয়ে স্বদেশ চর্চা তথা গ্রাম গঠনের এক উৎসাহের সঞ্চার করেন। আদর্শ গ্রাম তৈরির জন্য তরুণ মনকে তিনি উজ্জীবিত করে তোলেন। কোনো সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তায় তারা যেন আচ্ছন্ন না হয়। তিনি বলেন, পাড়ায় কারও অসুখ হলে তাকে ডাক্তারখানায় পাঠাবে—খবরদার ঝাড়-ফুঁক করতে দেবে না। এই সময় তিনি সাধারণ মানুষের মনে লোকশিক্ষার আদলে সংস্কারমুক্ত ধারণা তৈরি করার জন্য বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং মহাপুরুষদের জীবনী ব্যাখ্যা করে সাধারণকে শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন।

কবির জীবনে তাঁর মুক্ত চিন্তা তাঁর প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়ে তিনি প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি ওখানকার শিক্ষকদের বলেছেন, ''আশ্রমের পশু-পক্ষী, তরুলতার সহিত ছাত্রদের চিত্তের যোগসাধনের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। বর্ষায় সপ্তপর্ণ কুসুমোদগমের

উৎসব, শরতে শেফালি তলের উৎসব। বসন্তে শাল ময়ূরীর উৎসব করিতে হইবে।”

তিনি অজিত কুমার চক্রবর্তীকে লিখেছেন, ছেলেদের দৃষ্টিকে উদার ও চিত্তকে বিশ্বব্যাপী করে দেবার জন্যে যা আবশ্যক সেইটি তুমি বিশেষ করে দেখ। ওরা যেন কোনো জিনিসকে সংকীর্ণ করে না দেখে—ওদের মন যেন ওদের সংস্কারের দাস না হয়। সাহিত্য সভা প্রভৃতি স্থানে বার বার করে উপদেশ দাও যাতে ওদের হৃদয় সকল দিকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

জগদানন্দ রায়কে তিনি লিখেছেন, ‘‘তোমাকে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক চটি বই পাঠাব বলে কিনে রেখেছি। এগুলি খুব ভালো। শিশু পাঠ্য নয় অথচ সহজবোধ্য। এগুলি অবলম্বন করে তোমরা যদি ছেলেদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি লিখিত বক্তৃতা দিতে পার, তাহলে খুব ভাল হয়। এতে তাদের চিন্তার জড়ত্ব মোচন হবে, এইটেই সবচেয়ে বড় দরকার।”

১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানকার সাধারণ মানুষের মনের পরিবর্তন ও উন্নতির চেহারা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। জার শাসন মুক্ত হয়ে গোটা রাশিয়ার মাত্র ১৩ বছরের অগ্রগতি দেখে তিনি লিখেছেন, ‘‘প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি, আর ভাবি—কি হয়েছে আর কি হতে পারত। কয়েক বছর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষা যে আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাপ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না ওঠে। এজন্য প্রচুর আয়োজন এবং বিপুল উদ্যমের প্রয়োজন।”

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তি নির্ভর স্বচ্ছ চিন্তার পরিচয় তাঁর লেখায়, কথায় এবং কাজে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি এবং নানা বিষয়ে জানার কৌতূহলেরও পরিচয় পেয়েছি। তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মন ও মুক্ত চিন্তার দুটি বিষয় উল্লেখ করছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। গান্ধীজি জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত চাওয়া হলে তিনি বার্থ কন্ট্রোল রিভিউ পত্রিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন এবং বলেন, ‘‘এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের ফলে মায়েদের অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্বের দায় হতে মুক্তি মিলবে, দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ঘাটতির পরিমাণ কমবে।”

১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বহু লোক হতাহত হয়, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। এই আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা জেনে গান্ধীজি বললেন, ‘‘এই ঘটনা বিহারের মানুষের অস্পৃশ্যতাজনিত পাপ, বিধাতার কোপে এই ঘটনা ঘটেছে।” এই কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ অবাক হলেন। তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক মন প্রতিবাদ জানালো। তিনি বললেন, ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এটা কখনো পাপের ফল হতে পারে না। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারকে আগেও তিনি যেমন ঘৃণা ও বিদ্রূপ করেছেন, এবারও সেভাবে মহাত্মাজির ভূমিকম্প বিষয়ে বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন।

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক বই ‘বিশ্ব পরিচয়’—প্রকাশিত হলেও তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক আগ্রহ যে আশৈশব ছিল, তা তাঁর জীবন কাহিনি পাঠক মাত্রেই জানেন। আমরাও তা জেনেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তিবোধ ও মুক্তচিন্তাকে তিনি যেভাবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আত্মস্থ করেছিলেন, তা বহু বিজ্ঞানীর জীবনে কম দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন জীবনকে সম্যক জানতে হলে, বুঝতে হলে বিজ্ঞানমনস্ক হতেই হবে। অন্ধবিশ্বাসে মনপ্রাণ সঁপে দিলে অগ্রগতির পরিবর্তে পশ্চাদপসারণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন। কিন্তু তার বিজ্ঞানী সুলভ মনোভাব, বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ, বিজ্ঞানকে জনমুখী করতে বহুমুখী প্রচেষ্টা যে কোনো বিজ্ঞান কর্মীর কাছে পথের দিশারী ও প্রেরণার উৎস।

Email : prabirchandrabasu54@gmail.com., M. 9830676330

ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি মুক্তো

''ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য
কে করে বিচার। আপন বিশ্বাসে মত্ত
করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে?
যুক্তি কিছু নহে?''

''ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড় অশান্তির কারণ হয়, এমন আর কিছুই না...নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।...''

—ছোটো ও বড়, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

''...যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড় শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মত; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।''

—রাশিয়ার চিঠি; ৩রা অক্টোবর, ১৯৩০

''আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।''

ধর্মের সরল আদর্শ; ধর্ম

''সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকে সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খ্রিস্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণে এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভেতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না।''

''মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেবতার উপলব্ধি মোহমুক্ত হতে পারে, অন্তত হওয়া উচিত। হয় না যে তার কারণ, ধর্ম সম্বন্ধীয় সব কিছুকেই আমরা নিত্য বলে ধরে নিয়েছি। ভুলে যাই যে, ধর্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না। ভৌতিক বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে বলে বৈজ্ঞানিক মত মাত্রই নিত্য, এমন গোঁড়ামির কথা যদি বলি তা হলে আজও বলতে হবে, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ধর্ম সম্বন্ধে এই ভুলই ঘটে; সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম, আর ধর্মকে করে আঘাত।'' *—মানুষের ধর্ম*

''যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।''

'মানুষের ধর্ম'-র ভূমিকা

''...যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে,
ভাঙ্গো ভাঙ্গো, আজি ভাঙ্গো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্রহানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।''

—ধর্মমোহ, পরিশেষ ৩১ বৈশাখ ১৩৩৮

সংবাদ

এ পি জে আবদুল কালাম পুরস্কার পেলেন অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

ইনস্টিটিউট অফ ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (INST) ২০১৮ সালের এ পি জে আবদুল কালাম পুরস্কার প্রদান করলেন ড. অমিতাভ চক্রবর্ত্তীকে। রসায়নের শিক্ষক অমিতাভবাবুকে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের এই স্বীকৃতি জানানো হয়। ১৪ নভেম্বর ২০১৮ মোহালিতে ইনস্টিটিউশনের ফাইনম্যান লেকচার কক্ষে অনুষ্ঠিত INST Outreach Award অনুষ্ঠানে INST-র ডিরেক্টর অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রীমতি গুরুপ্রীত কৌর সাপরা (সাহিবজাদা অজিত সিং নগরের ডিসি) এই পুরস্কার অমিতাভ চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলে দেন।

২য় বর্ষ গণিত লেখক সম্মেলন

১১ নভেম্বর কলকাতা বরানগর রামেশ্বর হাইস্কুলে ২য় বর্ষ গণিত লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'গণিত ভাবনা' পত্রিকা এক বছর যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গণিত বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। গণিত বিষয়টি সহজ ভাবে জনপ্রিয় করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু : ১৬০ তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন

বীজপুর ড. বি.আর. আম্বেদকর গ্রীন পিস অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে হালিশহর ক্রেগপার্কে সারাদিন ব্যাপী বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়। সভায় জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞানের অবদান নিয়ে বিভিন্ন বক্তারা আলোচনা করেন।

শব্দ দূষণের প্রতিবাদে অবস্থান

২ নভেম্বর শান্তিপুর ডাকঘরমোড়ে শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে শান্তিপুর পরিবেশ ভাবনামঞ্চের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপি গণ অবস্থানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন জেলার বিজ্ঞান ও পরিবেশকর্মীরা এই অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন। শব্দ দূষণের ফলে হৃদরোগ, বধিরতা, স্নায়ু দৌর্বল্য, শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগরোগ, বিরক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক বৈকল্য সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ ও সমাজকর্মীদের সম্মেলন

চন্দননগর পরিবেশ আকাদেমি ও সবুজের অভিযানের উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্র সভাগৃহে সারাদিন ব্যাপী পরিবেশ ও সমাজকর্মীদের সম্মেলনের আলোচনা করা হয়। বিশ্বজিৎ মুখার্জী সম্মেলনে যৌথভাবে কয়েকটি কাজের প্রস্তাব দেন। ১) জল নিয়ে ভাবনা ২) শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে প্রচার ৩) সবুজায়ন ৪) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৫) বায়ু দূষণ ৬) জীব বৈচিত্র্যের ধ্বংস ৭) শিল্প ও মাটি দূষণ। সম্মেলনে রাজ্যের ৫৩টি সংস্থার ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির একটি তথ্যপঞ্জি প্রকাশ করা হয়।

With Best Compliments :

This Space is donated by

A Well Wisher

সম্রাট সরকার

স্মৃতিকথার বিল বাঁওর

ছেলেবেলায় আমাদের এক তুমুল মাস্টারমশাই ছিলেন। আমাদের গৃহশিক্ষক। সারা ছেলেবেলা জুড়ে আমার একমাত্র গৃহশিক্ষক। সব বিষয় পড়াতেন। তবে তার বাংলাভাষা শেখানোর পদ্ধতি আমাদের খুব আকৃষ্ট করত। নতুন নতুন বিষয়ে তিনি স্বাধীন লেখা তৈরি করতে উৎসাহিত করতেন। তার বাংলাভাষার ওপর দখল, বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমাদের অনুচ্চারিত গ্রামটির মায়ামাখানো বর্ণনা, আমার মনে গভীর ছাপ ফেলে দিয়েছিল সেইসব সারল্যমাখা দিনগুলোতে। আমাদের গ্রামটার শিরায় ধমনিতে বয়ে যেত একটি সুবিশাল বিল। বয়সার বিল। সেই বিলটার পশ্চিম পাড়ে আমবাগান ঘেরা এক বহু প্রাচীন পীরের যে দরগা ছিল, তার আনাচে-কানাচে বসত 'গাজী ফকিরের মেলা'। শীতের শুরুতে দিন সাতেকের এক জৌলুসহীন গ্রাম্যমেলা। আমাদের মাস্টারমশাই সেই মেলা নিয়ে লিখতে বসে বয়সার বিলের এক চোখধাঁধানো বর্ণনা দিলেন। হেমন্তের পড়ন্তবেলায় টই-টুম্বুর বয়সার বিল, সরের জঙ্গল, জেলেপাড়ার ছোট ডিঙিনৌকা, লালচে-কালো হয়ে আসা আকাশপটে বাঁদুরের ঝাঁক আর গাজীতলা থেকে ভেসে আসা মেলার ভেঁপুর আওয়াজ—সব লিখে দিলেন খাতা ভর্তি করে। তারপর থেকে রোজ পড়া শেষ করে বিকেলবেলায় ছুটে যেতাম বয়সার বিলে। বিলের জলে সন্ধ্যে কেমন করে মিশে যায় দেখতে। মাস্টারমশাইয়ের লেখা একটা লাইন খুব মনে পড়ত। 'সূর্য পাটে গেলে বিলের কালো জলের অন্ধকারে চুপিচুপি মুখ নামিয়ে কথা বলে কারা'। আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম অন্ধকার নেমে আসলে বয়সার বিলের আধডোবা সর, কাশবনে সত্যিই বুঝি কেউ কথা বলে রোজ। কখনো বক-সরাল-বালিহাঁসের ঝাঁক, কখনো জেলেপাড়ার মানুষজন, কখনো ঝিঁঝিঁপোকা, কখনো ব্যাঙেদের দল—তারা সবাই চুপিচুপি কথা বলে বয়সার বিলের কালো জলে সন্ধ্যে নেমে আসলে। সেইসব ফিসফিস কথা বিলের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসে পৌঁছে যেত আমার স্কুলে, মায়ের শীতল ষষ্ঠির আয়োজনে, ঢেঁকির ঘরে, গোয়াল ঘরে—আমার ছোটবেলার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এভাবে মাস্টারমশাইয়ের মুখ, তার কথা বলার আকর্ষণ পেরিয়ে বয়সার বিল বয়ে যেতে শুরু করল আমার শিরায়-ধমনিতে।

অতঃপর বড় হলাম। গ্রামজীবনের চেনা ছন্দে আছড়ে পড়ল মুক্ত অর্থনীতি, বিশ্বায়নের ঢেউ। জেলেপাড়ার পড়শিরা কলকাতায় গেলেন কাজ করতে। ছোট ডিঙিনৌকোগুলো বিলের পূর্বদিকের উঁচু জমিতে নিস্তেজ পড়ে রইল। বয়সার বিলের পূর্বপ্রান্তে চাষ-আবাদ দুদ্দার করে এগোতে লাগল। চাষের জমির পিছু পিছু ধেয়ে এল কারখানার কাঁটাতার। দু-চার ঘর বসতি। কংক্রীটের পিলার গিয়ে বসল বিলের দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ সরের জঙ্গলে। উঁচু উঁচু ইলেকট্রিক টাওয়ার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ততদিনে বিলের মাঝ বরাবর। লরিকে লরি বালি আসে আর বিল ভরাট হয়। সাহেববাগানের সামনের যে জায়গাটায় কায়েম পাখিদের হইহল্লা (Swamphen) লেগেই থাকত সেখানে একদিন এক দঙ্গল অচেনা মুখ জমি মাপার ফিতে ফেললেন। রাত বিরেত শহর ফেরত লোকজনকে হুমকি। ব্যাস... পাঁচিল এগিয়ে চলল। বয়সার বিল খুবলে খুবলে খাওয়া শুরু হল। আমার শিরায় শিরায় বয়ে যাওয়া বয়সার বিল বাঁধা পড়ল দলীয় পতাকায়, গ্রামীন রাজনীতির প্যাঁচে। কত পরিচিত মানুষ পেটের দোহাই দিয়ে বদলে গেলেন। আর পাঁচজন মানুষের মত মাস্টারমশাই হারিয়ে গেলেন আমার জীবনবৃত্ত থেকে। কিন্তু তার সেই লাইনটি পিছু ছাড়ল না আমার। আমাকে প্রতিনিয়ত দাঁড় করিয়ে দিত প্রকৃতির মাঝে। আমাদের গ্রামের খাল, বিল, নদী, নালাগুলোর কাছে। যথাক্রমে খাল, বিল, বাওড়গুলো হয়ে উঠল আমার ভালোবাসার অঞ্চল। আমার প্রকৃতি চেনার জায়গা। দেখার জায়গা।

অতঃপর একটু সর্বজনীন হলাম। গ্রাম, শহর, জেলা,রাজ্যের গন্ডি পেরিয়ে একদিন দেখতে গেলাম আমাদের দেশের অন্যতম বড় মিষ্টি

ছবি : তাপস মজুমদার

জলের বিল ওড়িষার মঙলাজোড়ি। সেখানে গিয়েও কানে বাজে এককথা। ''...চুপিচুপি মুখ নামিয়ে কথা বলে কারা।''

কারা কথা বলে বিলের জলে মুখ নামিয়ে? শুনতে পাওয়া যায়? দেখতে পাওয়া যায় সেসব কথা? আমার তো মনে হয় শোনা যায়। কথা বলতে দেখা যায়। মোটা মোটা সরের বনে, কচুরিপানায়, আধডোবা ঘাসে, শালুক-পদ্মের পচা ডালে, কাদায় মুখ নামিয়ে কথা বলে কত বিচিত্র দেশি-বিদেশি পাখি। আর কথা বলে মাছ, সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়। তাদের নিজেদের হাজার-লক্ষ বছরের যৌথ বেঁচে থাকার গল্প।

মঙলাজোড়ি এক সুন্দর কাহিনি। একদা পাখিশিকারীদের স্বর্গরাজ্য আজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জলাভূমির পাখি দেখার জায়গা। চোরাশিকারীর হাতে আজ নৌকার হাল, পাখি চেনার গাইড বুক। স্বল্পশিক্ষিত মানুষগুলো গড়গড় করে বলে দেবে পরিযায়ী পাখিদের খটমট নাম। যেমন Black-tailed Godwit মুখ নামিয়ে জলের নীচ থেকে কাদা ঘেঁটে খাবার খুঁজছে।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন একটা জলাভূমিতে জীব-উদ্ভিদ মিলিয়ে লক্ষাধিক প্রজাতির প্রাণ বর্তমান। তারপরও আরো কিছু প্রজাতি আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। আমরা তাদের হদিশ জানিই না! আর আছে মানুষজন। সব মিলিয়ে একটা জলাভূমি। এই লক্ষ-লক্ষ প্রাণ একে অপরের সঙ্গে শত-শত বন্ধনে জড়িয়ে। তাদের কারো জীবনবৃত্তান্ত অন্য কারো জীবন ছাড়া সম্পূর্ণ নয়।

শুধু কি বিজ্ঞান বারবার উঠে দাঁড়াবে এসব কথা বলার জন্য? কোনো কিছু—যা আদিম, আজন্মকালের—যা ঐতিহ্য, আবেগ তা কেবল যুক্তির কাঠামে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাতে হবে? এর বাইরে কোনো পরিসর নেই যে পরিসরে মানুষকে বোঝানো যাবে জলাভূমির গুরুত্ব?

মঙলাজোড়ির গল্প সেই অন্য পরিসরের কথা বলে। সেখানকার দেহাতি মানুষগুলো শিখেছে বিল বাঁচলে তারা বাঁচবে। বিল বাঁচলে পাখি আসবে। পাখি দেখতে হাজার পর্যটক আসবে। দুটো পয়সা আসবে নিজেদের। আসছেও। বিকল্প পথ দেখাতে শুরু করেছে মঙলাজোড়ি।

এযাবৎ আমি পক্ষীপ্রেমী হয়ে উঠেছি। আমার প্রকৃতি সংক্রান্ত আবেগ আজ পক্ষীকূলের প্রতি চূড়ান্ত পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের গল্প শুনতে, বুঝতে বহুবার মঙলাজোড়ি গেছি। তাদের ''চুপিচুপি মুখ নামিয়ে কথা'' বলা দেখেছি।

এসব মঙলাজোড়ির স্বাভাবিক স্থিরচিত্র। যে ছবি একটা সফল গল্প বলে। এই বিশ্বজনীন নদী-জলাভূমি ধ্বংসের বাজারেও। এ এক বিকল্প পথের গল্প। মানুষের সাথে বাকি জীবজগতের সহাবস্থানের গল্প। যে গল্পগুলোর শেষ নেই। জীবন ছুঁয়ে জীবনের গল্প আবর্তিত হতেই থাকে।

অতঃপর সেই অনর্গল চুপিচুপি কথা বলা শেষ হয় না। আমি আবার গিয়ে দাঁড়াই আমাদের অনুচ্চারিত গ্রামে। বয়সার বিলের ধারে। ইদানিং আমার নয় বছরের পুত্রের হাত ধরে। বিলের পশ্চিম আকাশে অসংখ্য ইলেকট্রিক টাওয়ার। গাজী ফকিরের আমবাগান এখন আগের মত ঘন নেই। বিলের দক্ষিণ দিকে বড় বড় অট্টালিকা। বিলের মাঝে সরের জঙ্গল আর নেই। আর হ্যাঁ, বিল আর আগের মত ফি-বর্ষায় টই-টুম্বুর হয় না। বিলে জল আসার প্রায় সমস্ত নালাগুলো বুজিয়ে বসতি, রাস্তা, চাষের জমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গাজী ফকিরের মেলায় এখন সেই সব রাস্তায় মোটরবাইক চড়ে, গাড়িতে চড়ে দিব্যি যাওয়া যায়। পায়ে কাদামাটির ছোঁয়াটি পর্যন্ত লাগবে না।

নয় বছরের বালকের হাত ছুঁয়ে সন্তর্পণে আমার ছোটবেলার মাস্টারমশাইয়ের গল্প বলি। সপ্তমীর সন্ধ্যায় জেলে পাড়ার নৌকো চুরি করে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে মাঝ বিলে শুয়ে রাতের আকাশ দেখা, সরের বনে শ্যামসুন্দর (Tri-coloured Munia), শোর বাবুইদের (Black-breasted Weaver) বাসা বানানোর কথা, পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে গাজীতলার আমবাগানে গিয়ে কান্নাকাটি, শীতের সময় জল নেমে গেলে সারাদিন ঘুড়ি ওড়ানো, আরো কত স্মৃতিকথা তাকে বলি। কখনো সঙ্গে করে নিয়ে যাই মঙলাজোড়ি। শোনাই বিলের জলে পাখ-পাখালির কলরব। পাখিগুলো জলের মধ্যে মুখ নামিয়ে কথা বলে বন্ধুদের সঙ্গে, মা-বাবা সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে। ভেজা ঘাস-জঙ্গল-কচুরিপানা সরিয়ে মাছ খায়, পোকা খায়, সাপ-ব্যাঙ খায়। তারা বেঁচে থাকে। বিল বেঁচে থাকে।

ছবি : তাপস মজুমদার

বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ পেরিয়ে জলাভূমির বাঁচিয়ে রাখার অন্য পরিসরের কথা বলি। বিল-বাওড় তো শুধু প্রকৃতির সম্পদ নয়, আমাদের আজন্মকালের আবেগ, ছোটবেলার সহজ সরল দিনগুলোর এক ঝিমধরা নিসর্গ, এক নস্ট্যালজিয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যার ধারক, বাহক। এছাড়া আমাদের আর কি আছে!

Email : samratswagata11@gmail.com., M. 9433962227

ক ম ল বি কা শ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

‘ধ্রুবতারা’ ধ্রুব নয়

সীমাহীন মহাবিশ্বে রয়েছে অসংখ্য তারাজগৎ। এক একটি তারাজগতের মধ্যে আছে লক্ষ কোটি নক্ষত্র। এরকমই একটি তারাজগতের নাম ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা। এখানে নক্ষত্র বা তারা আছে দশ হাজার কোটি। আমাদের সূর্য তার মধ্যে একটি। ছায়াপথের এক প্রান্তে থাকা সূর্যকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সৌরজগৎ। এই সৌরজগতের একটি গ্রহ পৃথিবী যেখানে আমাদের বাস।

সূর্যের আলোয় দিনে আকাশের দিকে তাকানো যায় না। সূর্য অস্ত গেলে, রাত নেমে এলে, আকাশের চেহারা পাল্টে যায়। ঝলমল করে ওঠে গ্রহ, উপগ্রহ আর লক্ষ লক্ষ তারা—যেন কালো ভেলভেটের উপর বসানো মণিমুক্তা। মিট মিট করে জ্বলা দূর আকাশে এদের দেখতে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তারারা আমাদের বন্ধু। যখন কম্পাস ছিল না তখন এরাই কম্পাসের কাজ করত। আদিকালে নাবিকেরা রাতের অন্ধকারে এই তারাদের দেখেই পথ খুঁজে পেত। ঋতুর পরিবর্তন, চাষবাসের সময় ইত্যাদি বুঝতেও প্রাচীনকালের মানুষরা আকাশের তারাদের উপর নির্ভর করত। ক্যালেন্ডার আবিষ্কারের আগে আকাশে এদের অবস্থান দেখেই সময়ের হিসেব রাখা হত।

দিনে সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় তারাদের দেখা যায় না। তাই সন্ধ্যা থেকে ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা এদের দেখতে পাই। তবে আকাশের সব তারাকে আমরা একসঙ্গে দেখতে পাই না। আবার সব তারাকে সব সময়ও দেখতে পাই না। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে আমরা যারা থাকি তাদের পক্ষে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ দেখা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনি দক্ষিণ গোলার্ধের মানুষ উত্তর গোলার্ধের আকাশের তারাদের দেখতে পায় না। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে সব তারাই পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যায়। শুধু একটি তারা আছে যেটা কখনও নড়াচড়া করে না। সন্ধ্যার আকাশে একে যেখানে দেখা যায় ভোররাতেও সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধের এই স্থির তারাটি ‘ধ্রুবতারা’ নামে পরিচিত।

সব তারা নড়াচড়া করলেও এই তারাটি নড়ে না কেন? এর কারণ তারাটির অবস্থান। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে যেমন ঘুরছে তেমন নিজের অক্ষের উপর লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। পৃথিবী পাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। সেই সঙ্গে আমরাও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছি। তাই আকাশের তারাদের দেখে মনে হয়, ওরা পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ওরা সরছে না, সরছি আমরা। ধ্রুবতারা আছে পৃথিবীর অক্ষ বরাবর। বলা যায় পৃথিবীর ছাদের উপর। আমরা কোনো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যদি নিজের চারপাশে ঘুরতে থাকি তাহলে এক একবার ঘরের এক একটি দেওয়াল দেখতে পাব। কিন্তু মাথার উপর ঘরের ছাদে যে ফ্যানটা ঝুলছে সেটা সব সময় দেখতে পাব। ধ্রুবতারার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটছে।

রাতের আকাশে তাকালে মনে হবে কিছু তারা মিলে যেন এক একটি ছবি এঁকে রেখেছে। কোনোটা মানুষের মত, কোনোটা জীবজন্তুর মত আবার কোনোটা বা অন্য ধরনের। এরকমই জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত একটি ছবি আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। সাতটি তারাকে নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে। একে আমরা বলি সপ্তর্ষিমণ্ডল (Constellation

Ursa Major)। তারাদের চেনার জন্য প্রাচীনকালের মানুষ আশপাশের কিছু তারাকে কাল্পনিকরেখা দিয়ে জুড়ে নানা পার্থিব আকৃতির সঙ্গে মিল খোঁজার চেষ্টা করেছে। এক একটা আকৃতি-বিশিষ্ট তারাদের একসঙ্গে বলা হয় মণ্ডল (Constellation)। আকাশে এরকম ৮৮টা মণ্ডল আছে। জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত সপ্তর্ষিমণ্ডলের মাথা বরাবর একটা কাল্পনিক রেখা যদি টানা যায় তবে সেটা গিয়ে ধ্রুবতারাকে স্পর্শ করবে। তাই অসংখ্য তারার ঝাঁকের মধ্য থেকে ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাওয়া আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়।

ধ্রুবতারাকে রোজই দেখা যায়। সন্ধ্যা থেকে ভোররাত—প্রতিদিনই সে দাঁড়িয়ে থাকে উত্তর মেরু বরাবর। হঠাৎ যদি সেটা ভ্যানিশ হয়ে

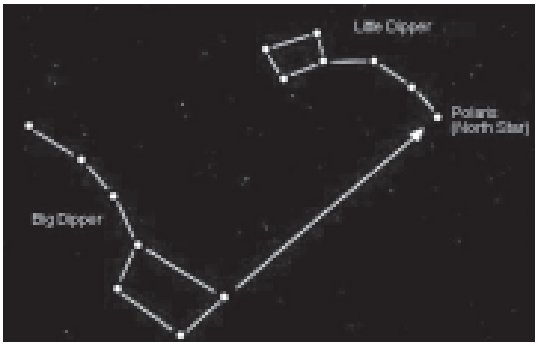

যায়, কেমন হবে? যত উদ্ভট কথা। তা আবার হয় নাকি? সেই প্রাচীনকাল থেকে ধ্রুবতারাকে দেখে আসছি, এখনও দেখছি, ভবিষ্যতেও দেখব। হ্যাঁ, ভবিষ্যতেও ধ্রুবতারা দেখব তবে এই তারাটিকে নয়। এখন

ধ্রুবতারা নামে যে তারাটিকে আমরা দেখি তার প্রকৃত নাম ‘পোলারিস’। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মত আকাশে আরও একটি সাতটি তারার মণ্ডল আছে। এর নাম লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল বা শিশুমার মণ্ডল (Constellation Ursa Minor)। এই মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা পোলারিস। এই তারাটি সূর্যের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বড়। স্বাভাবিকভাবে এর আলোও বেশি। সূর্যের তুলনায় আড়াই হাজার গুণ বেশি আলো দেয় এই তারাটি। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে (৪৩০ আলোক বর্ষ) থাকায় সাধারণ উজ্জ্বল তারার মত দেখায়।

প্রায় দু-হাজার বছর আগে পোলারিস ধ্রুবতারার আসন দখল করে। অর্থাৎ, এই তারাটি পৃথিবীর অক্ষের কাছাকাছি চলে আসে। বর্তমানে এটি অক্ষের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অক্ষ বরাবর অর্থাৎ, অক্ষের উপর আসতে তারাটির আরও প্রায় ৮৮ বছর সময় লাগবে। অর্থাৎ, আগামী ২১০০ সালে পোলারিস ঠিক উত্তর মেরুর উপরে আসবে। তারপর আবার শুরু হবে একটু একটু করে সরে যাবার পালা। এখন প্রশ্ন হল, পোলারিসের আগে ধ্রুবতারার জায়গাটি কার দখলে ছিল? না কি ধ্রুবতারা বলে কিছু ছিলই না? তাহলে তো পোলারিস সরে গেলে ধ্রুবতারা আবার ভ্যানিশ হয়ে যাবে? না, পোলারিস সরে গেলেও ধ্রুবতারা থাকবে। রাজার সিংহাসনে যেমন রাজা বদল হয়, তেমন নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্রুবতারার স্থান বিভিন্ন তারার দখলে যায়।

কালেয় নক্ষত্রমণ্ডলের (Constellation Draco) সবচেয়ে উজ্জ্বল তারার নাম ‘থুবান’। পোলারিসের আগে এই তারাটিই ধ্রুবতারা নামে

পরিচিত ছিল। তিন হাজার বছরের পুরানো মিশরের পিরামিডের গায়ে থুবানের কথা উৎকীর্ণ আছে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই তারাটিকে প্রচেতা বা ধ্রুব নামে উল্লেখ আছে। খ্রিস্ট জন্মের দু-হাজার আটশ বছর আগে থুবান উত্তর মেরুর ঠিক উপরে ছিল। তারপর একটু একটু করে সরতে থাকলেও প্রায় তিন হাজার বছর সে তার ধ্রুব অবস্থান বজায় রেখেছিল। তারপর পোলারিসকে সে তার সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পোলারিস এখনও আরও দু-হাজার বছর রাজত্ব করবে। অর্থাৎ, সে ৪০০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত আমাদের কাছে ধ্রুবতারা হয়েই থাকবে। তারপর তাকে ধ্রুবত্বের আসন ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে। এতদিনের রাজ্যপাট সব তুলে দিতে হবে বর্ষপর্ব মণ্ডলের (Constellation Cepheus) তারা ‘আলরাই’-এর (Alrai) হাতে। এই তারাটির রাজত্বকাল অবশ্য বেশিদিনের হবে না। হাজার দুই বছর পরেই তার জায়গায় চলে আসবে একই নক্ষত্রমণ্ডলের তারা ‘অগ্নিসম’ (Alprik)। এখন থেকে প্রায় বারো হাজার বছর পরে বীণামণ্ডলের (Constellation Lyra) তারা ‘অভিজিৎ’ (Vega) হবে ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারাদের মধ্যে এই তারাটিই সবচেয়ে উজ্জ্বল। এইভাবে চলতে থাকবে পালা বদলের পালা।

বর্তমানের তারাটি অর্থাৎ, পোলারিস আর কি ফিরে আসবে ধ্রুবতারার আসনে? আসবে। প্রায় পঁচিশ হাজার আটশ বছর পরে।

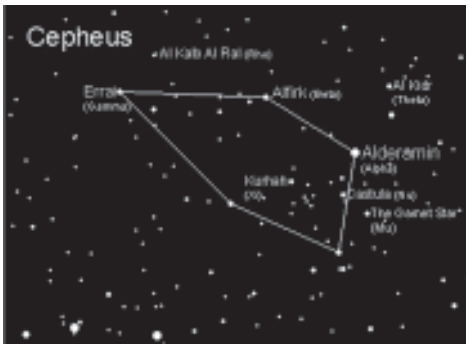

উত্তর মেরুর আকাশে যতগুলি মণ্ডল আছে তাদের একটা চক্র পূর্ণ করতে ঐ সময় লাগে।

কেন এমন হয়? ধ্রুবতারা ধ্রুব হয় না কেন? মেরু আকাশের মণ্ডলগুলি কেন সরে সরে যায়, আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারা ধ্রুবতারা হয়? এর জন্য দায়ী কিন্তু আমাদের পৃথিবী। উত্তর মেরুর আকাশের মণ্ডলগুলি স্থির হয়েই আছে। অল্প অল্প করে সরে যায় পৃথিবীর অক্ষরেখা। অক্ষরেখার এই সরে যাওয়ার গতিকে বলা হয় ‘সূক্ষ্মগতি’ (precession)। এই কারণেই ধ্রুবতারা স্থির হলেও চিরস্থির নয়। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন কোনো তারা ধ্রুবতারার স্থান দখল করে।

পৃথিবীর অক্ষরেখায় এই সূক্ষ্মগতি হওয়ার কারণ গ্রহটির আকৃতি এবং এর উপর সূর্যের আকর্ষণ। পাশাপাশি অবশ্য চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহেরও টান রয়েছে।

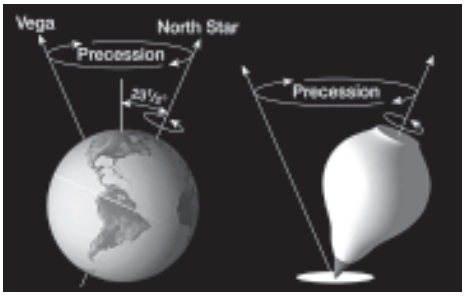

কোনো কোনো মানুষের পেটে চর্বি জমে ভুঁড়ি হতে দেখা যায়। পৃথিবীর পেটে অর্থাৎ, নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত ভর জমে সেরকমই ভুঁড়ির মত তৈরি হয়েছে। একুশ কিলোমিটার পুরু এই অতিরিক্ত ভর পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। এই কারণেই পৃথিবীর মেরুদেশ দুটি কিছুটা চাপা আর নিরক্ষীয় অঞ্চল কিছুটা মোটা। এই বাড়তি ভরের জন্য পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর একটু হেলেদুলে ঘোরে। এই হেলেদুলে ঘোরার দরুণই সূক্ষ্মগতির সৃষ্টি। পৃথিবীর এই হেলেদুলে ঘোরার কারণ ঐ বাড়তি ভরের বেল্টের উপর সূর্যের আকর্ষণ। সূর্য যখন নিরক্ষীয় রেখা বরাবর (২১ মার্চ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর) থাকে তখন আকর্ষণ লম্বভাবে এই বেল্টের উপর পরে। ফলে সেসময় কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু যখন কর্কট ক্রান্তি বা মকর ক্রান্তিতে থাকে তখন বেল্টের উপর এই টান তেরচাভাবে টলতে থাকে। আমরা

জানি মহাকর্ষ বল দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতি। যেহেতু বেল্টের উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে সামান্য হলেও দূরত্বের একটা পার্থক্য থাকে তাই দুই প্রান্তে সূর্যের আকর্ষণেরও তারতম্য ঘটে। এর ফলে পৃথিবীর অক্ষরেখা খুব ধীরে ধীরে কাঁপতে থাকে। এই কাঁপনের ফলেই তৈরি হয় সূক্ষ্মগতি। পৃথিবীর এই বেল্টের উপর সূর্য, চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহদের সম্মিলিত আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর সূক্ষ্মগতির মান দাঁড়ায় বছরে ৫০.২৯ সেকেন্ড অফ আর্ক। এই সূক্ষ্মগতির দরুণ পৃথিবীর অক্ষ ধীরে ধীরে সরে যায় এক মণ্ডল থেকে আর এক মণ্ডলের দিকে। অক্ষরেখার সূক্ষ্মগতি খুব কম হওয়ায় এই সরে যাওয়া কাজটি ১-২ দিনে হয় না। দীর্ঘ সময় লাগে। আর যখন যে মণ্ডলের যে তারা বরাবর পৃথিবীর অক্ষরেখা থাকে তখন সেই তারাটিই আমাদের কাছে ধ্রুবতারা নামে পরিচিত হয়।

আগেই বলেছি, বর্তমান ধ্রুবতারা 'পোলারিস' শিশুমার নক্ষত্রমণ্ডলের একটি তারা। এই মণ্ডলটিকে প্রাচীনকালের পন্ডিতগণ হাঁটু ভাঁজ করা মানুষ রূপে কল্পনা করেছিলেন। আর এই কল্পনা থেকেই প্রাচীন ভারতে জন্ম নেয় রাজা উত্তানপাদের পুত্র 'ধ্রুব'-র সিংহাসন লাভের কাহিনি। আপাত দৃষ্টিতে একে আষাঢ়ে গল্প মনে হলেও এর পিছনে রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। এই গল্পের 'ধ্রুব' প্রকৃতপক্ষে পোলারিস তারা। আর ধ্রুব-র সিংহাসন লাভ হল থুবানের জায়গায় পোলারিসের মেরু তারকা হওয়া। এই কাহিনি থেকে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতের পন্ডিতেরা জানতেন যে ধ্রুবতারা ধ্রুব নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধ্রুবতারা নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি আছে। ফিনিশীয়দের 'সাম্পো অপহরণ' কাহিনি প্রকৃতপক্ষে এক ধ্রুবতারা থেকে অন্য ধ্রুবতারার পরিবর্তনের কথা।

মানুষের লেখা গল্পগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ছল-চাতুরির কথা লেখা থাকলেও মহাকাশে কিন্তু এমন কোনো ঘটনা ঘটে না। সেখানে যা কিছু ঘটে প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে। পোলারিসের আগে থুবান ছিল ধ্রুবতারা। প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে সে সরে গেছে, এসেছে পোলারিস। সময়কাল পূর্ণ হলে পোলারিসও সরে যাবে। তখন ধ্রুবতারা হবে আলরাই। এই ভাবেই চলতে থাকবে পৃথিবীর অক্ষরেখার সূক্ষ্মগতির চক্র। একটি চক্র পূর্ণ হতে সময় লাগে ২৫৮০০ বছর। তাই বলা যায় একবার ধ্রুবতারার আসন পাবার পর প্রতিটি তারাকে দ্বিতীয়বার ধ্রুবতারার আসন পেতে পঁচিশ হাজার আটশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমান ধ্রুবতারা পোলারিসকেও তাই করতে হবে।

Email : kbb.scwriter@gmail.com., M. 9433145112

অ নি ন্দ্য দে

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান

ফানেলে তেল জমে কেন?

ফানেল দিয়ে বোতলে তেল ভরেছেন কখনও? কিছুটা তেল ঢালার পরে ফানেলের মধ্যে একটু তেল জমে যেতে দেখেছেন নিশ্চয়ই। তখন ফানেলটা একটু তুলে নিলেই ঐ জমা তেল আবার বোতলে পৌঁছে যায়। কেন বলুন তো? আসলে ফানেলটা বোতলের মুখে চেপে বসে থাকে বলে তেল যখন বোতালের ভিতরে ঢোকে সেখানকার বায়ু বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই সে আয়তনে কমতে থাকে। এখানে বায়ুর উষ্ণতার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না বলে ঐ বায়ুর চাপ বাড়তে থাকে। বায়ুর চাপ বাড়তে বাড়তে যদি এমন হয় যে সে ফানেলের তরল স্তম্ভকে ধরে রাখতে পারছে, তখন ফানেলে জমা তেল আর নীচে নামতে পারে না। ফানেলকে বোতল থেকে একটু তুলে ধরলে বোতলের বায়ু বাইরে চলে যেতে পারে, ফলে চাপ আবার কমে যায়। তখন তেল আবার নীচে পড়তে শুরু করে।

নদীর কলতান

প্রকৃতির কোলে বসে নদীর কলতান আমরা সকলেই শুনেছি। কিন্তু ঐ জলধারার কলকল শব্দের পেছনের কারণটা কী? কারণটা আর কিছুই নয়, বুদ্বুদ। নদীর জলে আটকে পড়া বায়ু বুদ্বুদের কম্পনেই তৈরি হয় ঐ শব্দটা আপনি বাড়ি বসেও এই কলধ্বনি তৈরি করতে পারেন। দুটো গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে একটা থেকে অন্যটাতে জল ঢালুন। কলতান শুনতে পারেন, তার সাথে সাথে দেখবেন জলে কিরকম বুদ্বুদ তৈরি হচ্ছে।

M. 9432220412

রা জ দী প ভ ট্টা চা র্য

কুকুরও কি রং বদলায়!

নীতিকথার গল্পে সেই নীল শিয়ালের কথা আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ পালাতে গিয়ে ধোপা বাড়ির নীল রংগোলা পাত্রের জলে হাবুডুবু খেয়ে শিয়ালের গায়ের রং হয়েছিল নীল। ফলে পশু সমাজে নীল শিয়াল হয়ে উঠেছিল আশ্চর্যজনক প্রাণী। সম্প্রতি নভি মুম্বই এলাকায় প্রায় ছয়টি এমনই নীলচে সাদা কুকুরের সন্ধান পেয়েছেন পরিবেশবিদ্‌রা। তাহলে কি কুকুর জগতে এ এক এক নতুন প্রজাতির সূচনা। গিরগিটির মত রং বদলাতে শুরু করল কুকুরও!

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে কেউটে সাপের কথা। কুকুরের রং বদলের পিছনে পাওয়া গেছে এক হতাশাজনক চিত্র। নভি মুম্বই এলাকায় তালোজা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া তালোজা এবং কাসাডি নদী একসাথে মিলিত হয়ে গিয়ে পড়ছে পনভেল খাঁড়িতে। আজ থেকে বছর পনের আগেও এই কাসাডি নদী ছিল স্থানীয় কোলি সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রধান অবলম্বন। কোলিরা মূলত মৎস্যজীবী। সেই সময়ে বর্ষাকালে জোয়ারের জলের সাথে সাথে আরব সাগর থেকে বিপুল পরিমাণে মাছ নদীতে প্রবেশ করত। ক্যাটফিস ছাড়াও ম্যাকারেল, হাঙর, তেলাপিয়া, পমফ্রেট, ভারতীয় স্যামন, বম্বে ডাক, বাগদা ও গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি প্রায় ৪৫ প্রজাতির মাছ এবং অন্যান্য জলজ জীব নদী থেকে সংগ্রহ করা হত। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই নদীর উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত। কিন্তু বিগত দশ-বারো বছরে পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করে। কাসাডি নদীর দুপাশে অসংখ্য কলকারখানার বিকাশ এবং সেই সব কারখানা জাত বর্জ্য পদার্থ, রাসায়নিক অবশেষ দ্বিধাহীনভাবে কাসাডি নদীতে ফেলায় দ্রুত জলজ বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নদীতে মাছের পরিমাণ প্রায় ৭০% কমে যায়। নদীর জলের ব্যাপক গুণগত অবনমন ঘটে। অবস্থা এতটাই খারাপ হয় যে ২০১৩ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের মৎস্য দপ্তর কাসাডি নদীতে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বাধ্য হয়।

নদী ও স্থান	TCC (Total Coliform Count)
1. ভাগীরথী/বহরমপুর	১.১০ লক্ষ
2. ভাগীরথী/দক্ষিণেশ্বর	৪ লক্ষ
3. ভাগীরথী/শিবপুর	২.৮০ লক্ষ
4. ভাগীরথী/গার্ডেনরীচ	২.৪০ লক্ষ
5. মহানন্দা/শিলিগুড়ি	১৪ হাজার
6. তিস্তা/শিলিগুড়ি	৭ হাজার
7. করলা/জলপাইগুড়ি	১৪ হাজার
8. কালজানি/আলিপুরদুয়ার	১৪ হাজার
9. দামোদর/আসানসোল	৯০ হাজার
10. বরাকর/তারাপীঠ	১৭ হাজার
11. কাঁসাই/প. মেদিনীপুর	১৭ হাজার
12. দ্বারকা/তারাপীঠ	৩.৪ হাজার

মহারাষ্ট্র পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের (MPCB) তথ্য অনুযায়ী তালোজা শিল্পাঞ্চলে প্রায় ২১৫৭ একর এলাকা জুড়ে প্রায় ১০০০টি ঔষধ, খাদ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা গড়ে উঠেছে। এদের সকল আবর্জনা ও ক্ষতিকর রাসায়নিক ট্রিটমেন্ট করে CETP (Common Effluent Treatment plant) এর মাধ্যমে কাসাডি নদীতে পড়ার কথা।

এই বিষ ধারণ করেই কাসাডি নদী বিগত এক যুগে পরিণত হয়েছে নীলকণ্ঠে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। যান্ত্রিক ত্রুটি, অদক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা CETP পরিচালনা, শ্রমিকদের বিক্ষোভ ইত্যাদি কারণে ২০১৭ সালের মার্চ মাস থেকে CETP-র কাজকর্ম আক্ষরিক অর্থে শিকেয় উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ সরাসরি ক্ষতিকর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য প্রতিদিন নদীর জলে মেশায় তা একেবারেই দূষণের চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের উদ্যোগে সম্প্রতি কাসাডি নদীর জল পরীক্ষা করে BOD-র যে মান পাওয়া গেছে তা আশঙ্কাজনক। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী BOD-র মান ৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের বেশি হলে নদীর জল মানুষের ব্যবহারযোগ্যতা হারায়। আর ৬ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের বেশি হলে সেখানে মাছেরা বাঁচতে পারে না। সেই তুলনায় কাসাডি নদীর জলে সেই মান ৮০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় কাসাডির জল ১৩ গুণের বেশি দূষিত। তাছাড়া ক্লোরাইড এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের মাত্রাও নদীর জলে অত্যন্ত বেশি। এই সব দূষিত পদার্থের সমাহারে কাসাডি আজ সত্যিই নীলকণ্ঠ। ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য রাসায়নিক প্রস্তুতকারী সংস্থার বর্জ্যে নদীর জলের রং বদলে গেছে। স্থানীয় কুকুরগুলি নদীর জলে সাঁতার কাটায় তাদের লোমের রংও পরিবর্তিত হয়েছে, সাদা রং হয়েছে

নীলচে। এই জল পানে বিভিন্ন জীবজন্তুর স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। অস্বাভাবিক ভাবে পাখিদের মৃত্যু দেখা যাচ্ছে নদী এলাকায়। দেরিতে হলেও MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে এই বিষয়ে। তালোজা শিল্পাঞ্চলে জলের সরবরাহ কমানো হয়েছে। CETP যাতে ঠিক ভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। তালোজা শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনাল কাসাডির তীরে ৩৭১টি কারখানা বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছে।

কাসাডি নদীর ঘটনা ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, কাসাডি একটি উদাহরণ মাত্র। সারা দেশ জুড়েই এই ধরনের চিত্রের কোনো অভাব নেই। মহারাষ্ট্রের এই ঘটনার কথা শুনে পশ্চিমবঙ্গবাসী রূপে উল্লসিত হওয়ার কোনো সুযোগও নেই। আমাদের রাজ্যেও নদীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই একই পরিস্থিতির শিকার। হুগলি, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্প ও দৈনদিন বর্জ্য নদীগুলিকে প্রতিদিন দূষিত করে তুলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্নান করারও অযোগ্য। একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান দিয়ে লেখাটি শেষ করলে পাঠকের ভাবনা নির্মাণে সুবিধা হবে।

২০১৫ সালে এ রাজ্যে নদীর জলে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই ব্যাকটেরিয়ার মাত্রা প্রতি ১০০ মিলিলিটার জলে ৫০০ এর মধ্যে থাকলে তা স্বাভাবিক মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা এবং অন্যান্য নদীতে কলিফর্ম-এর মাত্রা একঝলকে এ রাজ্যের জলসম্পদের স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা দিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হবে।

Email : rajdip5678@gmail.com., M. 9836569850

শংকর নারায়ণ দাস

দৈনন্দিন জীবনে অবিজ্ঞান

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু করি, তার বেশিরভাগই অবৈজ্ঞানিক। টুথপেস্ট কেনা থেকে বাড়ি গাড়ি কেনা, প্রাতরাশ খাওয়া থেকে রাতের খাবার বা উৎসব অনুষ্ঠানে আকণ্ঠ গেলা পর্যন্ত। কিংবা সাধারণ জ্বরের ওষুধ কেনা থেকে শুরু করে ডাক্তারের দুর্বোধ্য হাতের লেখা প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কেনা ইস্তক সবাই অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার। কমদামী বেশিদামী টুথপেস্ট ব্যবহার করাও যা, নুন দিয়ে মুখ ধোওয়াও সেই একই ব্যাপার। আসল কথা হল খাবার পর ভালো করে ব্রাশ করে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণা বের করে দিয়ে মুখের ভেতরটা জীবাণুমুক্ত করা। যা দামী মাজন দিয়ে হয়, তা শুধুমাত্র নুন দিয়েও হয়। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের প্রোডাক্ট ব্যবহারের জন্য চ্যানেলে চ্যানেলে মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। কোনো বিশেষ ব্রান্ডের টুথপেস্ট ব্যবহার করলে ট্যাঁড়াব্যাঁকা মিশকালো দাঁতও নাকি মুক্তমালার মত সুন্দর সাদা হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ বিশেষ হেলথ্‌ড্রিঙ্ক খেলে আপনার ছেলে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী এবং প্রথম হয়ে উঠবে। কেন? শক্তিশালী না হলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না? যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত তারা সবাই কি লম্বা? যারা লম্বায় খাটো তারা কি বুদ্ধিমান হতে পারেন না? সেসব দামী, রঙচঙে, আকর্ষণীয় প্যাকেটবন্দী তথাকথিত হেলথ্‌ড্রিঙ্ক কেনার সময় ওসবের আদৌ দরকার আছে কিনা, সাধারণ ঘরোয়া খাবারে সেসব পুষ্টি পাওয়া যায় কিনা তা আমরা ক'জন ভাবি?

আসি সাবানের কথায়। প্রশ্ন হল, সাবান খায় না গায়ে মাখে? সাবানের বিজ্ঞাপনগুলো দেখে তো মনে হয় যে সাবান আসলে খাওয়ার জিনিস, আমরা ভুল করে গায়ে মাথায় মাখছি। কারণ বিভিন্ন সাবানে থাকে দুধ, মালাই কেশর, আনারস, লেবু, কমলালেবু, গোলাপের পাপড়ির রস, রূপোর কণা, আরো কত কি। কোনো কোনো সাবান শুঁকলে গায়ে মাখার বদলে খাওয়ার ইচ্ছেই মনে আসে। অবশ্য বিজ্ঞাপনে নীচের দিকে খুদে খুদে অক্ষরে 'ইতি গজ' গোছের কিছু লেখা থাকে বটে। সেগুলো প্রায়শই অস্পষ্ট। সে লেখা পড়ার জন্য নয়, আইন বাঁচানোর জন্য। স্নানের সাবানের কাজ কি? গায়ের ময়লা পরিস্কার করে চামড়াকে জীবানুমুক্ত রাখা। এ ব্যাপারে সাধারণ সাবান আর মেডিকেটেড সাবানের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। মেডিকেটেড সাবান যেখানে ৯৯% জীবাণুমুক্ত করতে পারে, সেখানে সাধারণ সাবান ৯৭% জীবাণুমুক্ত করতে পারে। সাবান কেনার ক্ষেত্রে যা দেখা উচিত তা হল এর টি.এফ.এম. (Total Fatty Matter)-এর শতকরা হার। এই টি.এফ.এম. বা টোটাল ফ্যাটি ম্যাটার ভালো মানের সাবানে থাকবে ৮০%, যাকে 'এ' ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। আর টি.এফ.এম. ৬০% হলে তাকে 'সি' ক্যাটাগরিতে ফেলা হয়। যেমন লাইফবয় সাবান 'সি' ক্যাটাগরি বা 'গ্রেড ৩' এবং বিদেশে মানুষের স্নানের জন্য নিষিদ্ধ। সেখানে এটা কিছু পশুর জন্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে গণবন্টন ব্যবস্থায় 'কার্বোলিক' নামের যে সাবান দেওয়া হয় তার টি.এফ.এম. রেটিং ৬০%। অর্থাৎ 'সি' ক্যাটাগরির সাবান।

তেমনই বিভিন্ন কোম্পানির ফর্সা হওয়ার ক্রিমগুলো কেনার জন্য

যাঁরা উতলা হন তাঁরা কি ভেবে দেখেন যে সে সব ক্রিম কালো মেয়েদের ফর্সা করতে পারে কিনা? বাজার চলতি বেশিরভাগ স্কিন ক্রিমেই স্টেরয়েড থাকে। এগুলো ব্যবহার করে সাময়িক চাকচিক্য আসে বটে, তবে পরবর্তী সময়ে ত্বকের নানারকম সমস্যা তৈরি হয়। বিজ্ঞাপন দেখে ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করা উচিত নয়। শুধু নারকেল তেল অথবা জলপাই তেল ব্যবহার করা যেতে পারে।

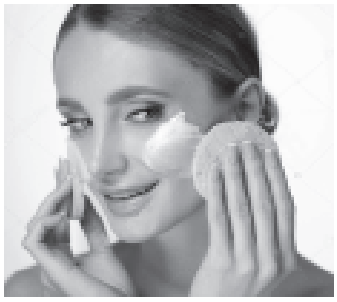

শুধু ত্বকের সমস্যা কেন, শারীরিক কোনো সমস্যা হলে প্রথমেই তো আমরা ডাক্তারের কাছে যাই না। পাড়ার দোকান থেকে অসুখের লক্ষণ বলে ওষুধ কিনে খাই। প্রায়শই সাময়িক আরাম পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর অন্যরকম সমস্যা নিয়ে আসে। তারপর যে যার মত ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, কাঠমিস্ত্রি, ধোপা, নাপিত, কাজের মাসি ইত্যাদি পরিষেবা পাওয়ার সূত্রে পরিচিত লোকদের কাছ থেকে ডাক্তারের পরিচয় এবং যোগ্যতা জেনে নিয়ে, তার সঙ্গে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে যাকে মনে ধরে তার কাছেই চিকিৎসার জন্য যাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের ভিজিট এর পরিমাণ দেখেই তার যোগ্যতা নির্ণয় করি। কিন্তু আমি দেখেছি, আজ থেকে পনেরো ষোলো বছর আগে দুশো টাকা ভিজিটের স্বদেশী ডিগ্রীধারী ডাক্তার একই ওষুধ লিখেছিলেন। তার দু-একটার কোম্পানিও এক, বাকিগুলোর কোম্পানি আলাদা, তবে প্রিপারেশন এক। অবশ্য চল্লিশ টাকার ডাক্তার দুটো ওষুধ কম লিখেছিলেন। একটা ক্রিমির ওষুধ,

আর একটা ভিটামিন সিরাপ। এই ভিটামিন ওষুধ শরীরের জন্য অদরকারী। কারণ, পেট খালি থাকলে ভিটামিন ওষুধ কোনো কাজে লাগে না, আর পেট ভরে সুষম খাদ্য খেলে ভিটামিন ওষুধের কোনো দরকারই পড়ে না। এসব বহিরাগত ভিটামিন বেশিরভাগই আমাদের মলমূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়, আর যেগুলো থেকে যায় সেগুলো বের করতে শরীরের যন্ত্রপাতির উপর চাপ পড়ে। ওসব ভিটামিন ওষুধ কিনে খাওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। আর ক্রিমির ওষুধ তো ছমাস পর পর খেতেই হবে। এ সব ছাড়াও বাজারে দুই বা ততোধিক ওষুধ মিশিয়ে তৈরি করা বা কম্বিনেশন এর নানারকম ওষুধ পাওয়া যায়। ডাক্তারবাবুরা হরদম লিখেও থাকেন সেসব। কিন্তু এসব অবৈজ্ঞানিক আর বিপজ্জনক। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন, বিবর্তনের ফলে এবং মুড়ি মুড়কির মত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহারের ফলে অনেক জীবাণুই ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। অনেক জীবাণুই তাদের চারদিকে একটা আবরণ বা 'শেল' তৈরি করে ফেলে। এই 'শেল' ভেদ করার উপাদান এবং জীবাণু মারার উপাদান দুটো মিশিয়ে একটা ওষুধ তৈরি হতে পারে। তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বৈকি। কিন্তু সবক্ষেত্রেই কম্বিনেশন এর ওষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

আগেকার দিনে জ্বর, মাথাব্যথা, পেটব্যথা, পেটখারাপের ওষুধ গ্রামের মুদী দোকানে পাওয়া যেত। লোকে কিনতও সেসব। এখনও প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে, যেখানে কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা নিদেনপক্ষে হাতুরে ডাক্তারও নেই সেখানে মুদীখানা কিংবা পানের দোকানে ওষুধ বিক্রি হয়। সে সব নিতান্তই পরিস্থিতির কারণে। কিন্তু যেখানে ডাক্তার আছে, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ওষুধের দোকান আছে সে সব জায়গায় ঠেলাগাড়ি, সাইকেল রিক্সা বা রিক্সা ভ্যানে মাইক লাগিয়ে নানারকম তথাকথিত লিভার টনিক, অ্যালার্জিনাশক ফল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বব্যথাহর বাম বা মলম, কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ, যৌনক্ষমতা বাড়ানোর ওষুধ ইত্যাদি বিক্রি হয়। অশিক্ষিত লোকের পাশাপাশি অনেক শিক্ষিত লোকেরা সে সব ওষুধ কিনে খাচ্ছে। এর পাশাপাশি খবরের কাগজ, টিভির বিজ্ঞাপন দেখেও টাকে চুল গজানোর ওষুধ, লম্বা হওয়ার ওষুধ কিনে খান অনেকেই। আচ্ছা, ওসব লিভার টনিকগুলো কি আদপেই কি ওষুধ? না কি ফুড সাপ্লিমেন্ট? না কি কোনোটাই নয়? কেননা, যতদূর জানি লিভার বা যকৃৎ এমনই একটা অঙ্গ, যে বাইরের কোনো কিছুই গ্রহণ করে না। শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি থেকেই এর কর্মক্ষমতা বজায় থাকে। কাজেই কোনরকম লিভার টনিক খাওয়াই অর্থহীন, অর্থের অপচয় মাত্র। আর গ্যাস অম্বল মাথাব্যথা শতকরা আশিভাগ ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করলেই সেরে যায়। আর, তা ছাড়া রাস্তার প্রচারগাড়ি থেকে বা টিভিতে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ওষুধ কিনব কেন? অসুখ হলে, রোগের লক্ষণ দেখে কোনো বিশেষ রোগের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তবেই ডাক্তারবাবু ওষুধ লেখেন। প্রাথমিক লক্ষণ দেখে নিশ্চিত হতে না পারলে আনুষঙ্গিক প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা করাতে বলেন। তারপর রোগীর শারীরিক অবস্থা দেখে সেইমত ওষুধ লেখেন। ওষুধও তৈরি হয় ধাপে ধাপে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। প্রথমে জীবাণুর ওপর ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। তারপর মনুষ্যেতর প্রাণী, যেমন ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোশ, বাঁদর ইত্যাদির ওপর পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যায়ে মানবদেহে প্রয়োগ করে দেখা হয় বার বার। তারপর বাজারে আসে কোনো ওষুধ। এর পরেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার প্রয়োগ এবং পরীক্ষা চলতে থাকে। আর এই পরীক্ষার ফলাফল দেখেই তার কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়। কাজেই, ''বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে'', শুধু এটা শুনেই ওষুধ কেনাটা নেহাতই বোকামো।

Email : sankar2016narayan@gmail.com.,M. 9775693931

শব্দের খোঁজে ৮

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১		২		৩		৪		৫
		৬						
৭						৮		
					৯			
			১০				১১	
১২		১৩			১৪			
				১৫			১৬	১৭
	১৮					১৯		

পাশাপাশি :

১. এই নদীর উৎস অমরকন্টক।

৩. পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য তিন অক্ষরে নাম, মাথা বাদ দিলে পরাজয়।

৬. ক্যাবেরীযান দ্বীপপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য দেশ যার তিন অক্ষরে নাম মাঝের অক্ষর বাদ দিলে সাধক ক্ষ্যাপা।

৭. তিন অক্ষরে অরণ্য প্রথম দুইয়ে বা একে-তিনে আমাদের মাথার দুই পাশে থাকে।

৮. নোবেল বিজয়ী মার্কিন কৃষিবিজ্ঞানী, সবুজ বিপ্লবের প্রণেতা—বরলোগ।

১০. আকাশ, আবার গগনও।

১১. জমির উর্বরতা বৃদ্ধিকারী পদার্থ।

১২. বৃষ্টিভেজা দিনে আকাশে সাত রং-এ ফুটে ওঠে।

১৪. হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে কৃষ্ণপ্রিয়া।

১৬. নদনদীর অকস্মাৎ জলস্ফীতি, বন্যা।

১৮. এই গুল্ম জাতীয় লতার উপকারীতা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় অনস্বীকার্য। প্রথম দুই অক্ষরে ঘোড়াকে বোঝায়, শেষ দুইয়ে ঘ্রাণ।

১৯. —— পুর, এই শহর নেপাল সীমান্তে অন্তর্গত উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত।

উপর নীচ :

২. গাছে-গাছে ঘষা খেয়ে যে আগুন উৎপন্ন হয়।

৩. এইটি রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিষ্কার।

৪. এই রশ্মি স্থূল বস্তু ভেদ করে ভিতরের বস্তু দেখাতে পারে।

৫. দিল্লী, মুম্বই, চেন্নাই ও কলকাতা শহরগুলিকে যা বলা হয়।

৭. এই পর্বতমালার অবস্থান পাকিস্তানে। প্রথম দুইয়ে গারদ, শেষ দুইয়ে সীতাপতি।

৯. ভরদ্বাজ গোত্রের পাখি বিশেষ, শকুন্তলার পুত্র।

১০. পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ।

১১. ইন্টারনেট ও কম্প্যুটার সম্বন্ধীয় বহুল ব্যবহৃত শব্দ —— ক্রাইম।

১৩. বাংলাদেশের এক নদী, এর উল্লেখ কবিগুরুর 'বাঁশী' কবিতায় পাওয়া যায়" —— নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।

১৫. প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত মহাজনপদ যা বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ার প্রদেশের অন্তর্গত, মহাভারতের 'শকুনি' এই রাজ্যের রাজপুত্র।

১৭. রাতের আকাশে ঝিক্‌মিক্ করে।

উজ্জ্বল গোস্বামী

কি রেখে যাব

কি রেখে যাব তোদের জন্য
প্লাস্টিক নদী, কংক্রিট মাঠ
দাপিয়ে বেড়ানো দূষণ দানব
করাবে তোদের প্রকৃতিপাঠ!

কোথায় স্নেহ কোথায় সবুজ
সব বিকোবে শপিং মলে
মানুষরা সব নিরুদ্দেশে
রাস্তাঘাটে রোবট চলে

কার্টুনিস্ট : সৌরভ মুখার্জী M. 8961401423

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 ● জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 ● কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 ● নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 ● উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 ● ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 ● শিয়ালদহ, যাদবপুর ও রাণাঘাট স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ●

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস

e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

যাঁরা হারিয়ে যাচ্ছে — রাজা রাউত

স্তন্যপায়ী

রেড পান্ডা Red Panda

বিজ্ঞান সম্মত নাম *Ailurus fulgens*

হিমালয়ের প্রায় ৫০০০ ফুটের উপরের উচ্চতায় বসবাসকারী প্রধানত কঁচি বাঁশের পাতা ও ডগার উপর নির্ভরশীল এই প্রাণীটি মূলত নেপাল, সিকিম, পার্বত্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে পাহাড়ী ব্রাহ্মদেশ ও দক্ষিণ চিনে পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুর্লভ এই প্রাণীটি অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

পক্ষী

লম্বা চঞ্চু শকুন Slender billed Vulture

বিজ্ঞান সম্মত নাম *Gyps tenuirostris*

এই ধরনের শকুনের মাথা পালকহীন, গলা ও ঠোঁট লম্বাটে ধরনের। এর সংখ্যা ভারতে প্রায় ৯৭ শতাংশ কমে গেছে—এই মুহূর্তে মহাবিপন্ন এই প্রজাতি। অথচ একসময় সারা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ীবাসিন্দা ছিল।

সরীসৃপ

বাটাগুর কাছিম Indian River Terrapin

বিজ্ঞান সম্মত নাম *Batagur baska*

পৃথিবীর অন্যতম দুর্লভ ও বিপন্নতম এই কাছিম বর্তমানে গুটিকয়েক বেঁচে আছে কেবলমাত্র সুন্দরবন অঞ্চলে। সুন্দরবনের আবদ্ধ প্রজনন কেন্দ্রে অধিকাংশ বেঁচে থাকা এই কাছিমকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া দু-একটি মাদ্রাজ কুমীর কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সংখ্যায় ৫০ এর কম বেঁচে রয়েছে সারা পৃথিবীতে।

উভচর

সাদাছিটে ব্যাঙ White spotted bush Frog / Gunther's Bush Frog

বিজ্ঞান সম্মত নাম *Raorchestes chalazodes*

অন্যতম দুর্লভ ব্যাঙ—ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কিছু অংশে সীমাবদ্ধ। একসময় বহুদিন লুপ্ত মনে করা এই ব্যাঙটি ২০১১ সালে কালাক্কদ মুন্ডানথুরাই ব্যাঘ্র বনাঞ্চল, তামিলনাড়ুতে পুনরায় আবিস্কার করা হয়।